প্রকাশক ঃ কলকাতা কনসালট্যান্ট
এ ইউনিট অফ "কমিউনিটি অ্যাকশন সোসাইটি"

ইতিবাচক অভিভাবকতা ও শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা

একটি সহায়ক পুস্তিকা

THE HOPE FOUNDATION
HOPE

সহায়তা ঃ
হোপ ফাউন্ডেশন
কলকাতা

সি-৫৩৩
লেক গার্ডেনস
কলকাতা - ৭০০ ০৪৫

মে ২০১৪

ভূমিকা

শিশুর মানসিক, মনো-সামাজিক, অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ কিভাবে হয় ও শিশুর এই বিকাশ সাধনে অভিভাবকদের ভূমিকা কি কি তা এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন মনঃচিকিৎসক, মনোবিদ ও গবেষকদের উদ্যোগে শিশুর বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়, কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এই ব্যাপারে কি কি দায়িত্ব আছে এগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা এখন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু দেখি, বুঝি, বিচার-বিবেচনা করি, ও আমাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলিরও সমধান করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হল আরও বেশি ফলপ্রসূ, বোধগম্য ও উন্নত সমাজ কিভাবে গড়ে তোলা যায় ও কিভাবে বিভিন্ন নেতিবাচক চিন্তা বা মানসিকতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় সেই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা।

এই বইটি মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই প্রত্যেক অধ্যায়ে শিশুর সাথে তার অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রূষাকারীর সম্পর্কের দৈহিক ও মানসিক দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

অভিভাবকরা কিভাবে নিজের শিশুকে জানবে সেইসব বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক অভিভাবকের নিজের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা উচিত, সেটা হল "আমি কি আমার শিশুকে জানি ?"। এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনার আগে শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় সেটা জানা দরকার। শিশু যে দৈহিক, মানসিক, আবেগমূলক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিপক্কতা অর্জন করে বা বড় হয়ে ওঠে তাকেই শিশুর বিকাশ বলা হয়। শিশুর বিভিন্ন বিকাশের কিছু পদ্ধতি নির্ধারিত থাকে, সে একটির পর আরেকটি স্তরে পদার্পণ করে, যেমন- হামাগুড়ি দেওয়া, তারপর হাঁটা ইত্যাদি। যখন শিশুর এই বিকাশগুলি ঠিক সময়মত এই নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী হয় না তখনই শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়া, স্মরন প্রক্রিয়া ইত্যাদির বিকাশ ও বিশ্বজগৎকে বোঝার প্রক্রিয়ার বিকাশকে জ্ঞানমূলক বিকাশ বলা হয়। অভিভাবকদের এই সমস্ত বিকাশমূলক স্তর সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার যাতে তারা কোন নির্দিষ্ট বয়সে শিশুর চাহিদাগুলি বুঝতে পারে ও শিশুদের কাছে অযৌক্তিক চাহিদা না রাখে যেটা শুধু শিশুর বিকাশকেই ব্যাহত করবে না শিশুর আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেবে। একিরকমভাবে মনোসামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় আবেগমূলক (আবেগের প্রকাশ, ইতিবাচক আবেগ, নেতিবাচক আবেগ), সামাজিক (যে সমাজ বা পরিবেশে শিশু বাস করে ও যে সমাজ তাকে রীতনীতি শেখায়) এবং নৈতিক (পারিবারিক মূল্যবোধ) বিকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে ইতিবাচক অভিভাবকতার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে। প্রত্যেক অভিভাবকই তার শিশুকে ইতিবাচক চিন্তাধারা ও বিভিন্ন নৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে বড় করে তুলতে চায়। এখানে ইতিবাচক অভিভাবকতা অভিভাবকদের শ্রেণীভুক্ত না করে অভিভাবকরা কি কি উপায়ে শিশুকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিতে পারবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর আবেগমূলক পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা গোড়ে ওঠার জন্য অভিভাবকদের সাথে শিশুর সুসম্পর্ক থাকা খুবই জরুরী। শিশুদের সবসময় অতিরক্ত মাত্রায় নিরাপত্তার মধ্যে রাখা যেমন ঠিক নয়, সেরকমই আবার একেবারে একা ছেড়ে দেওয়াও উচিত নয় কারন তাতে শিশুরা অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় , এই

ব্যাপারে অভিভাবকদের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলা দরকার। শিশুরা অভিভাবকদের বন্ধু হিসাবে চায়। কিশোর-কিশোরীরা বন্ধুদের সাথে থাকতে বেশী পছন্দ করে কারন তারা মনে করে তাহলে তাদের জীবনের অনেক গোপন কথা বন্ধুদের কাছে বলতে পারবে। শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে এই ব্যবধান মিটিয়ে ফেলা দরকার।অভিভাবকরা যে আচরণ শিশুদের থেকে আশা করে সেসব শুধু মুখে না বলে তাদের নিজেদেরও ঠিক সেই আচরণ শিশুদের সামনে করা উচিত। শিশুদের মধ্যে কিভাবে ইতিবাচক মনোভাব আনা যায় সেটাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। শিশুরা তার অভিভাবকদেরই প্রথম অনুকরনীয় ব্যক্তি বলে মনে করে ও অভিভাবকরা যা করে সেটা করতেই চেষ্টা করে, তাই এই সময় শিশুদের সামনে সঠিক মনোভাব, চিন্তাধারা ইত্যাদি তুলে ধরা দরকার।

পরবর্তী অধ্যায়ে অভিভাবকদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা শিশুর সুস্বাস্থ্যকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বেশীরভাগ সময়ই আমাদের বিভিন্ন মানসিক চাপ, উদ্বেগ ,রাগ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে যখন আমরা বাইরের জগতের সাথে অনেকসময় মানিয়ে নিতে পারি না তখন অনেক নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, ক্লান্তিভাব জমাট বাধে ও সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাড়ির লোকেদের উপর এমনকি অনেকসময় শিশুদের উপরও যেটা শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। বিভিন্ন মানসিক চাপের জন্যই আমরা অনেক নেতিবাচক আচরণ করে থাকি,যেমন- ঝগড়া, চিৎকার, হতাশ হয়ে পরি , অভিভাবকদের এই ধরণের আচরণগুলি শিশুকে প্রভাবিত করে। এই পরিস্থিতিগুলির সাথে অনেকসময় মোকাবিলা করা কঠিন মনে হলেও বাস্তবে দেখা গেছে সেটা অতটাও শক্ত নয়। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মানসিক চাপগুলি আলাদা ধরণের ও তাদের উৎসও আলাদা, তাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আলাদা পদ্ধতিতে সমস্যা অনুযায়ী সেগুলির সমধান করতে হবে। শ্বাসক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যায়াম, সমস্যাগুলি খাতায় লিখে ফেলা, আরও বেশি করে ইতিবাচক মনোভাব গোড়ে তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে এইসব পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করা জায়। ভয় ও উদ্বেগ এই দুটি খানিকটা একই ধরণের অনুভূতি। উদ্বেগই আমাদের ভয়ের কারন, উদ্বেগ আমাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা বাড়ায়। এগুলির কারন হতে পারে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সঙ্কট, প্রচণ্ড কাজের চাপ ইত্যাদি।এই উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণেরও অনেক উপায় আছে, এই অধ্যায়ে সেগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। উদ্বেগ ও মানসিক চাপের মতো রাগেরও নেতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলি নিয়ন্ত্রণও করা সম্ভব।

এই বইটির শেষ অধ্যায়ে শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই নিয়মানুবর্তিতা বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার,নিয়মানুবর্তিতা মানেই কঠোরতা নয়। নিয়মানুবর্তিতা হল এমন কিছু বাধ্য বাধকতা যার দ্বারা একজনের মধ্যে সঠিক মনুষ্যত্ববোধ গড়ে ওঠে।শিশুদের চিন্তাধারা ও কার্যকারিতা গুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়মানুবর্তিতা শেখানো দরকার।অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রূষাকারীরা নিজেরা এই নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে শিশুদেরকেও শেখাতে পারেন। কোন শিশুই জন্ম থেকে কোন নিয়ম কানুন শিখে আসে না, কিন্তু জন্ম থেকেই তাদের মধ্যে কিছু আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত দুই ধরনের শিশু দেখা যায়,অনেক শিশুদের দেখা যায় যারা চিন্তা বেশি করে, ও অন্য কিছু ধরনের শিশু যারা বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। দুটোর কোনটাই খুব বেশি পরিমানে হওয়া উচিত না তাই এগুলি সঠিক জীবনের মান গঠনের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার।

শিশুকে অযথা শাস্তি না দিয়ে বা না মেরে তাকে এই নিয়মানুবর্তিতাগুলি শেখার সুবিধাগুলি বুঝিয়ে অথবা বলবৃদ্ধির বা পুরস্কারের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা গুলি শেখানো দরকার। অনেক শিশুর মধ্যেই জেদ দেখা যায়। এই জেদ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। ইতিবাচক হলে শিশুর মধ্যে দৃঢ়চরিত্র, ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং নেতিবাচক হলে শিশুর মধ্যে দ্বেষ, বিরোধ, বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা দেখা যায়। অকারনে জেদ, মেজাজ, স্কুল প্রত্যাহার, খাদ্য প্রত্যাহার, অসামাজিক আচরণ, স্কুল থেকে পালানোর প্রবৃত্তি শিশুর এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি অভিভাবকদের খুব যত্ন সহকারে মোকাবিলা করতে হবে। শাস্তি কিন্তু অনেকসময় এইসব আচরণকে বাড়িয়ে তোলে। তাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রষাকারীদের এইসব আচরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ও শিশু যাতে সঠিক মাত্রায় বিকাশলাভ করতে পারে সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। যেসব শিশুদের মধ্যে Autism, ADHD, Dyslexia, Dyspraxia ইত্যাদি দেখা যায় তাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া ও অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া দরকার।

তাহলে দেখা গেল, শিশুকে বড় করে তোলা একটি শিল্পকলা, একটি বৈজ্ঞানিক পরিচালনা, একটি বিকাশজনিত কার্যধারা। এটা শুধু শিশুকে পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাদের মধ্যে নীতিগত বোধ জাগিয়ে তোলা ও আত্ম পরিচিতি বোঝা ইত্যাদিও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক শিশুই একে অপরের আলাদা তাই তাদেরকে সেইমত আলাদাভাবে পরিচালনা করতে হবে। একজনের সাথে অন্যকে তুলনা করা উচিত না। তারা আলাদা সত্তা

স্বীকৃতি

আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই স্বামী অগ্নিপ্রিয়ানন্দ মহশয়কে (Vice Chancellor, Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur) তার মূল্যবান পরামর্শ, সময় ও সহায়তার জন্য, যার জন্য আমরা আজকের সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে ইতিবাচক অভিভাবকতা এই বিষয়টি সম্পর্কে একটি ধারনা গঠন করতে পেরেছি।

আমার এই কাজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আমাকে তাদের সহায়তা ও মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি ডঃ অনিরুদ্ধ দেব (Consultant Psychiatrist),শ্রীমতি রত্নাবলী রায়(Psychologist), শ্রী প্রশান্ত রায় (Associate Professor, Institute of Psychiatry, Kolkata), শ্রী মোহিত রনদিপ (Psychiatric Counsellor) এবং শ্রীমতি অনিন্দিতা চ্যাটারজ্জী (Psychologist) প্রমুখ ব্যক্তিগনের কাছে বাধিত থাকব।

আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী ধৃতি রায়কে (Assistant Professor, Calcutta University), যার উদ্যোগে আজকের অভিভাবকদের ইতিবাচক অভিভাবকতা বিষয়টি সম্বন্ধে প্রশিক্ষন দেওয়ার গুরুত্ব বা চাহিদা সম্পর্কে ভাবা হয়েছে ও তার সাথে সাথে এই পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়েছে।

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই Fr. মলয় বি ডিকস্টা (Educationist & Secretary, West Bengal Association of Christian Schools) মহাশয়কে তার অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য,তার অনুপ্রেরণাতেই আমরা আমাদের এই চিন্তাভাবনাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে পেরেছি। তারই সহয়তায় CAS এবং WBACS যৌথভাবে অভিভবকদের প্রশিক্ষন দেওয়ার ব্যপারে উদ্যোগী হতে পেরেছে।

শ্রীমতি দোয়েল ঘোষ (Psychologist) ও শ্রীমতি সুপর্ণা বরাটকে (Psychologist)আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই বইটি লেখার ব্যপারে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য, যাদের সাহায্য ছাড় অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রুষাকারীর জন্য এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। বাংলা ভাষায় রূপান্তর করার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী ঝুমা মণ্ডল কে এবং সবশেষে বাংলায় রূপান্তর এবং মুদ্রনের আর্থিক সহায়তার জন্য হোপ ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জানাই।

পার্থ রায়
নির্দেশক, কমিউনিটি অ্যাকশান সোসাইটি
মে, ২০১৪

সূচীপত্র

১। নিজের শিশুকে জানো..... ১-১৯

- মানসিক- অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ
  - শিশুকে জানা ও বোঝা
  - অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ
  - জ্ঞানমূলক বিকাশ
- মনো-সামাজিক বিকাশ
  - আবেগমূলক বিকাশ
  - সামাজিক বিকাশ
  - নৈতিক বিকাশ

২। ইতিবাচক অভিভাবকতার দক্ষতা..... ২০-৩০

- অভিভাবকত্ব
- সুসম্পর্ক
- শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ
- শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সুসম্পর্ক
- অনুকরনীয় ব্যক্তি
- অভিভাবকত্বের আবশ্যিকতা

৩। নিজেকে জানো..... ৩১-৩৬

- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- রাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৪। শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা..... ৩৭-৭৪

- নিয়মানুবর্তিতা
- মূল্যবোধের শিক্ষা
- শিশু ও কিশোরকিশোরী
- মানসিক ব্যাধি সনাক্তকরণ

১. নিজের শিশুকে জানো

এই অধ্যায় আমরা জানবো

- সামাজিক, মানসিক ও জ্ঞানমূলক দিক থেকে শিশুর বিকাশ
- অভিভাবকের ভূমিকা
- শিশুর বিকাশে সামাজিক প্রেক্ষাপট, শুশ্রূষাকারী (Caregiver) ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় ?

শিশুর বিকাশ বলতে বোঝায় তার দৈহিক , মানসিক, এবং আবেগজনিত বিভিন্ন পরিবর্তন যেটা তার জন্ম থেকে কৈশরকালীন সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়, এই সময় সে বিভিন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এবং তাদের উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হতে শেখে। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বিকাশ ঘটে লম্বভাবে অর্থাৎ এই বয়স পর্যন্ত সব শিশুই প্রায় একই নিয়মে দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং নতুন বিষয় শিখতে সামর্থ্যলাভ করে। ১৬ বছর বয়সের পর থেকে তার বিকাশ প্রক্রিয়া ঘটে সমান্তরালভাবে অর্থাৎ এরপর সে তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে।

বিকাশ কত ধরনের হয়?

বিকাশ প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়, সেগুলি হল -

- দৈহিক বিকাশ
- জ্ঞানমূলক বিকাশ
- আবেগজনিত বিকাশ
- সামাজিক বিকাশ
- নৈতিক বিকাশ

কি কি বিষয় শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে?

শিশুর বিভিন্ন জিনগত প্রক্রিয়া যেমন পরিনমন (matuaration) এবং শারীরিক অথবা জৈবিক পরিস্থিতিই বিকাশ-জনিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এছাড়া শিশুর বিকশে পরিবেশের ভূমিকাও অনেকখানি। বিকাশ প্রক্রিয়া হল বংশগতি ও পরিবেশের সংমিশ্রণ।

- প্রাক-জন্মকালীন বিষয়ঃ- বংশগতির প্রভাব, মায়ের স্বাস্থ্য।
- জন্মকালীন বিষয়ঃ- বিভিন্ন ধরনের প্রসব প্রক্রিয়া, সংক্রমণ , অক্সিজেনের উপস্থিতি।
- জন্মপরবর্তী বিষয়ঃ- পুষ্টি, পরিবেশ, শিক্ষনের সুযোগ, পারিবারিক পরিস্থিতি, সামাজিক বিষয়।

দৈহিক বিকাশঃ

দৈহিক বিকাশ কি ?

জন্মের পর শিশু ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালনমূলক দক্ষতা অর্জন করে। যেমন- হাত পা সঞ্চালন, কোনকিছু ধরতে পারা, হামাগুড়ি দেওয়া, হাটতে পারা ইত্যাদি। শিশুর এই প্রাথমিক বিকাশগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য। এগুলিকে অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ বলা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্রমাগত পরিবর্তন ও সংমিশ্রনের ফলই হল এই প্রক্রিয়া

- স্নায়ু-পেশীগত পরিনমন
- দৈহিক বৃদ্ধির হার
- জৈবিক পরিনমন
- গ্রহণযোগ্যতা
- নতুন গতিসঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

শিশুকে প্রাথমিক অঙ্গসঞ্চালন প্রক্রিয়াগুলি যেমন- কোনোকিছু ধরা, হামাগুড়ি দেওয়া, হাটতে পারা ইত্যাদি শেখাতে হয়না, তাকে চলাফেরার সুযোগ দিয়ে দেখা দরকার যে সে কি করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, পেশী ও হাড়সমূহ যখন তৈরী থাকে এবং পরিবেশ যখন শিশুটিকে সেগুলি পরিচালনা করার সঠিক সুযোগ দেয় সে তখন নতুন বিষয় শিক্ষালাভ করতে পারে। কোন নতুন বিষয় শিক্ষালাভ তাকে আরও অনেক কিছু শিখতে উৎসাহী করে তোলে এবং সে ধীরে ধীরে আরও নতুন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া একটি গতিবাহী ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। প্রতিটি শিশুই আলাদা আলাদা বংশগতি ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত এবং সেগুলিই তার বিকাশ প্রক্রিয়ার নির্ধারক। যেমন- যদি একটি শিশু কোন শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে একটি স্বাভাবিক শিশুর মত সঠিক মাত্রায় বিকাশলাভ করবে না এবং বয়স অনুযায়ী যে ক্রিয়াকলাপ গুলি করা দারকার সেগুলি করতে পারবে না, কিন্তু অনেকসময় তাকে ঠিকমত পরিচালনা ও সাহায্যের মাধ্যমে সে খুব তাড়াতাড়ি বিষয়গুলি শিখে নিতে পারে।

অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশের ধাপগুলি কি কি?

দক্ষতা	৫০ শতাংশ (50%)	৯০ শতাংশ (90%)
উল্টানো	৩.২ মাস	৫.৪ মাস
কোনকিছু ধরতে পারা	৩.৩ মাস	৩.৯ মাস
কোন অবলম্বন ছাড়াই বসা	৫.৯ মাস	৬.৮ মাস
কোনকিছু ধরে দাঁড়ানো	৭.২ মাস	৮.৫ মাস
আঙ্গুল দিয়ে ধরা	৮.২ মাস	১০.২ মাস
একা দাঁড়াতে পারা	১১.৫ মাস	১৩.৭ মাস
ভালভাবে হাঁটতে পারা	১২.৩ মাস	১৪.৯ মাস
দুটো কিউব দিয়ে টাওয়ার বানানো	১৪.৮ মাস	২০.৬ মাস
পা ফেলে হাঁটতে পারা	১৬.৬ মাস	২১.৬ মাস
লাফানো	২৩.৮ মাস	২.৪ বছর
বৃত্ত অঙ্কন	৩.৮ বছর	৪.০ বছর

বিকাশমূলক ধাপগুলি (Developmental Milestones) সম্বন্ধে আমাদের জানা কেন দরকার?

বাবা মা এবং শুশ্রূষাকারীদের শিশুর এই বিকাশজনিত ধাপগুলি জানা দারকার যাতে তারা শিশুদের কাছ থেকে অনেকসময় অকারনে যে চাহিদা গুলি করে সেগুলি থেকে বিরত থাকে। যেমন- যদি কোন বাবা মা তার ৩ বছরের শিশুর কাছ থেকে আশা করে যে সে ঠিকঠাক গোলাকার বৃত্ত আঁকতে পারবে এবং সেটা না পারাতে তাকে তিরস্কার করে তাহলে সেটা তাদের অহেতুক চাহিদা, যেহেতু আমরা টেবিল ১ দেখেছি ৩.৪ বছর বয়সে অথবা তার পরেই একজন শিশু পেশীগত দক্ষতা বা কোনকিছু সুদৃঢ়ভাবে ধরার সক্ষমতা অর্জন করে এবং সে তারপর সঠিকভাবে বৃত্ত আঁকতে পারে।

যদি একটি ৫ মাসের শিশুকে বিছানায় একা রাখা হয় তাহলে তার নিচে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। যেহেতু তখনও সে গভীরতার হিসাব করতে এবং পেশীগত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।

গভীরতা উপলব্ধি, কোন বস্তু এবং তার পৃষ্ঠ, ত্রিমাত্রা এগুলি বোঝার ক্ষমতা নির্ভর করছে বিভিন্ন ধরনের সূত্রের উপর যেগুলি চোখের রেটিনার উপর কোন বস্তুর ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে প্রায় ৫ মাস বয়সে উদ্ভূত দ্বিনেত্র সমন্বয়ের (যেখানে উভয় চোখ একসাথে কাজ করে) সাথে সাথে পেশীগত নিয়ন্ত্রণও জড়িত। ৫ থেকে ৭ মাসে, শিশুরা আপেক্ষিক আকার, ওজন এবং বস্তুর টেক্সচার ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সেগুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে। শিশুর মধ্যে এই উপলব্ধি (স্পর্শের মাধ্যমে বস্তুকে মনে রাখার প্রক্রিয়া) আসে যখন সে ঠিকমত চক্ষু-হাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে কোন বস্তুর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে ও সেটিকে ধরতেপারে(Bushnell & Boudreau, 1993)।

সামাজিক প্রেক্ষাপট কিভাবে একটি শিশুর উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে?

- বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেমন- বাড়ীতে, স্কুলে, খেলার মাঠে শিশুর অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশগুলি ঘটে। প্রতিটি সামাজিক পরিস্থিতিরই পেশীগত বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট চাহিদা আছে এবং সেগুলি সন্তানের পেশীগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ যে বাড়িতে শিশুর হামাগুড়ি দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে সেখানে শিশুটি নির্দ্বিধায় খুব তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দেওয়ার সাথে সাথে দাড়াতে ও হাঁটতেও শিখবে।
- অন্য দিকে, শিশু যদি এমন পরিবেশে থাকে যেখানে সে সবসময় খুব বেশি সুরক্ষিত তাহলে সে অনুসন্ধানের সুযোগ পাবে না। ফলে, তার বৃদ্ধি দেরিতে হবে এবং অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক ও আবেগজনিত বিকাশও প্রভাবিত হবে।
- জীবনযাপনের ধরন, লিঙ্গ, পরিবারের আকার, ভাইবোনের সংখ্যা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ,বাসস্থানের পরিবেশ (গ্রামীণ ,শহরতলিসুলভ, এবং শহুরে) - এগুলি দেখা গেছে শিশুর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়।
- মজার বিষয় হল, প্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তানের অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ কনিষ্ঠ সন্তানের থেকে বেশী ভাল হয় এবং এর কারন হিসাবে মনে করা হয় যে প্রথম সন্তান বেশী মাত্রায় মায়ের প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। (Malina, ১৯৮০, ১৯৮৩).
- ছেলেদের গুরুতর পেশীসঞ্চালনমূলক অথবা অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশ মেয়েদের থেকে বেশী ভাল হয় কারন ছেলেরা পরিবেশকে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশী উৎসাহী।
- শিশুর প্রতিপালনের পরিবেশের তারতম্যও তার পেশীসঞ্চালনমূলক অথবা অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশে এক সাহায্যকারী উপাদান। শিশুকে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাকে সবসময় অতিরিক্তি মাত্রায় নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে, এখানেই পার্থক্যটি লক্ষ্য করা যায়।
- বিশ্ব জুড়ে অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশের মোটামুটি একটি আদর্শমানের সময় নিরুপণ তালিকা অনুসরণ করা হয়।
- বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বসবাসকারী শিশুর বিকাশের স্বাভাবিক হার ভিন্ন হতে পারে। আফ্রিকান শিশুরা বসা, হাঁটা ও দৌড়ানোতে আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান শিশুদের তুলনায় অধিক উন্নত। উদাহরণস্বরূপ, উগান্ডাতে শিশুরা সাধারণত ১০ মাস বয়সে হাঁটতে শেখে, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশুরা ১২ মাসে এবং ফ্রান্সে ১৫ মাসে হাঁটতে শেখে (Gardiner ও অন্যেরা, 1998)। কিছু সংস্কৃতিতে শিশুর শীঘ্র পেশীগত দক্ষতা অর্জনকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শিশুর পেশীগুলিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিশেষ কিছু নিত্যকার্যসূচি পরিচালনা করা হয় (Hopkins ও Westra, 1988)।স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর জন্য একইরকম সময়নিরুপণ তালিকা অনুসরণ করা হয় না।
- স্নায়ু-পেশীগত বিকাশের স্বাভাবিক সময়সূচি ও কোন বয়সে সেগুলি ফলাফল হবে তা বাবা মা এবং শুশ্রুষাকারীদের জানা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা সবচেয়ে অনুকূল চাহিদাগুলি প্রকাশ করতে পারে এবং শিশুর আরও ভাল বিকাশের জন্য তাকে সাহায্য করতে পারে।

একটি শিশুর পেশীসঞ্চালনমূলক বিকাশ তার অন্যান্য বিকাশের সাথে কিভাবে জড়িত ?

শিশুর জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পেশীসঞ্চালনমূলক অথবা অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশের অবদান অনেকখানি। উদাহরণস্বরূপ, যে শিশুর বিলম্বিত পেশীসঞ্চালন হয়েছে অথবা যে শিশুটি পেশীসঞ্চালনমূলক অক্ষম সে তার শারীরিক গঠন নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে ফলে সে মানসিক দিক থেকেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু পেশীসঞ্চালনমূলক বিকাশ প্রত্যক্ষন ও জ্ঞানমূলক বিকাশের সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

জ্ঞানমূলক বিকাশঃ

জ্ঞানমূলক বিকাশ কাকে বলে ?

জ্ঞানমূলক বিকাশ হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যেখানে সচেতনতা, প্রত্যক্ষন (Perception), যুক্তি ও বিচার-বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত। কখন এবং কিভাবে শিশু জানতে শেখে, চিন্তা করে, সমস্যার সমাধান করতে পারে , কিভাবে তারা মনে রাখতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এই সবকিছুই জ্ঞানমূলক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত।

শিখনের ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক বিকাশের অবদান কি?

চিরায়ত সাপেক্ষন (Classical Conditioning): যদি কোন একটি শিশুকে বারবার ক্যামেরার আলোর সম্মুখীন করা হয় সে ক্যামেরার আলোতে চোখের পলক ফেলবে। সে ক্যামেরার সাথে আলোর যে সংযোগ তা শিখে নেবে এবং শুধু ক্যামেরা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পলক ফেলবে। একে চিরায়ত সাপেক্ষন বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে যদি ক্যামেরার আলো না দেখে তাহলে সে আর শুধু ক্যামেরা দেখেই চোখের পলক ফেলবে না। সেক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার বিলুপ্তি ঘটবে আরও পরিষ্কারভাবে জানতে অন্য একটি উদাহরণ দেখা যাক যেখানে একটি শিশু তার বাবাকে রোজ মদ্যপান করে বাড়িতে ঢুকে তার মায়ের সাথে ঝগড়া করতে দেখে, বাবার বাড়ি ফেরাটা তার কাছে অতটা ভয়ের বিষয় নয় কিন্তু ঝগড়াটা তার কাছে প্রকৃতপক্ষে ভয়ের ঘটনাক্রমে যখন এটি বার বার হতে থাকে তখন বাবার বাড়ি ফেরাটাই শিশুর কাছে ভয়ের কারন হয়ে ওঠে। এটি চিরায়ত সাপেক্ষনের নীতি অনুসরণ করেছে। যদি শিশুটির বাবা মা অনেকদিন ঝগড়া না করে তাহলে সে আবার তার বাবার বাড়ি ফেরাটাকে ভয় পাবে না। একে বলে পুনঃসাপেক্ষীকরন (Reconditioning)।

অপেরেন্ট সাপেক্ষনের (Operant Conditioning): এই ধরনের শিখনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। শিশুর স্নেহময় হাসি শুশ্রুষাকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তারা আরো বেশি করে শিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়া করে যেটা শিশুর আবেগজনিত বিকাশলাভে সহায়ক। এই অপেরেন্ট সাপেক্ষনের উপর ভিত্তি করে আচরনকে গঠন, পুনরাবৃত্তি, শক্তি অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটি আচরনগত পরিবর্তন সাধনে সহায়ক।এই তত্ত্ব অনুযায়ী যখন শিশুর আকাঙ্খিত আচরন পুরস্কৃত হয় তখন তার মধ্যে সেই আচরণটি বেশী করে দেখা যায়, আবার যখন তার অস্বীকৃতিপূর্ণ আচরন দণ্ডিত হয় তখন সে ওই আচরনটি পরিত্যাগ করে।

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন শিশু ঠিকঠাক বৃত্ত আঁকার জন্য তার শিক্ষক দ্বারা প্রশংসিত হয় তখন সে আরও উৎসাহিত হয়। যদি একজন শিশু এক বৃদ্ধকে রাস্তা পারাপার হতে সাহায্য করে এবং সে প্রশংসিত হয় তাহলে তার ওই আচরনটি পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। একইভাবে যখন কোন নেতিবাচক আচরণ যেমন চিৎকার করা, মেজাজ দেখানো উপেক্ষা করা হয় তখন সেই আচরণগুলি পুনরায় হওয়ার শক্তি কমে যায়।

আচরণ প্রতিরূপ (Behaviour Modeling): মা যখন আরশোলা দেখে ভয়ে চিৎকার করে তার শিশুকে জড়িয়ে ধরে এবং সেই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যায় তখন শিশুটি শেখে যে আরশোলা এমন কিছু যেটা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন অনেক গ্রহনযোগ্য অথবা অগ্রহনযোগ্য আচরণই আমরা অনুসরণ করে শিখি।সুতরাং যদি প্রাপ্তবয়স্করা গ্রহনযোগ্য ব্যবহার করে তবে শিশুরাও এগুলি অনুসরন করবে।

নেতিবাচক ও ইতিবাচক অভিভাবকতার প্রতিরূপ (Negative & Positive Parental Modeling) : যদি কোন শিশু তার মাকে পরিচারিকার উপর চিৎকার করতে দেখে তবে সে ভাবতে পারে যে পরিচারিকা হল অধস্তন এবং তাদের উপর চিৎকার করা যায়। এটি হল নেতিবাচক অভিভাবকীয় প্রতিরূপ। অন্যদিকে যখন কোন শিশু তার বাবা মাকে অন্যদের খারাপ সময়ে তাদের সাহায্য করতে দেখে তাহলে সেটা ইতিবাচক অভিভাবকীয় প্রতিরূপ। বিভিন্ন নৈতিক ও বাস্তব জীবনের ঘটনা বলটাও শিশুদের ইতিবাচক প্রতিরূপ গঠনে সহায়ক।

জ্ঞানমূলক বিকাশের বিভিন্ন ধাপগুলি কি কি?

সেনসরি মোটর স্টেজ (Sensory-Motor Stage : ০-২বছর):-পিয়াজের (Piaget's) প্রথম পর্যায়

এইসময় শিশু শিক্ষালাভ করে প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং বিভিন্ন বস্তু তা গঠন অনুযায়ী শক্ত কি নরম তা নিপুণভাবে পরিচালনার মাধ্যমে।

সেনসরি মোটর পর্যায়ের মূল উন্নয়ন:
- বস্তুর উপস্থিতি
- স্থানিক জ্ঞান
- সতর্ক
- সংখ্যা
- বিভাগ
- অনুসরণ

প্রিঅপারেশানাল স্টেজ (Pre-Operational Stage : ২-৭ বছর):- পিয়াজের (Piaget's) দ্বিতীয় পর্যায়

শিশু ২ বছর বয়স থেকে কথা বলতে শেখে ও তা ৭ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশুর মধ্যে তখনও বস্তুগত বিচারক্ষমতা আসে না ও সে মানসিকভাবে তথ্য পরিচালনা করতে পারে না। শিশুর খেলাধুলা ও ভান করার বৃদ্ধিলাভ এই পর্যায়েই হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বস্তুকে দেখতে শিশু তখনও অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

প্রিঅপারেশানাল পর্যায়ের মূল উন্নয়ন:
- প্রতীক ব্যবহার
- ব্যক্তিগত পরিচয় বোঝার ক্ষমতা
- কারণ ও প্রভাব বোঝা
- শ্রেণীবিভাগের ক্ষমতা
- সংখ্যা বুঝতে পারা
- সহানুভূতি
- মনের তত্ত্ব

কনক্রিট অপারেশানাল স্টেজ (Concrete operational Stage: ৭-১১ বছর) : পিয়াজের (Piaget's) তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়টি হল যথাযথ যুক্তি ব্যবহারের পর্যায়। এই সময় শিশুর চিন্তাধারা "প্রাপ্তবয়স্কদের মত' পরিপক্ক ও পরিণত হয়।এখন থেকেই তারা আরও যুক্তিপূর্ণভাবে কোন সমস্যার সমাধান করতে শুরু করে। তারা বিভিন্ন প্রস্তাবনামূলক যুক্তিগকে একত্রিত করতে পারে।-প্রস্তাবনামূলক যুক্তি হল কোন সাধারণীকরণের জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই পর্যায়ে সাধারণত শিশু সঠিক যুক্তি গঠনে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন- একটি শিশু A>B ও B>C বুঝতে পারবে কিন্তু যখন তাকে A>C এর মানে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন হয়ত সে যুক্তি দিয়ে প্রশ্নটি বুঝতে পারবে না।

ফরমাল অপারেশানাল স্টেজ (Formal Operational Stage: ১১-১৮ বছর) : পিয়াজের(Piaget's) চতুর্থ পর্যায়

বয়ঃসন্ধিকালই জ্ঞানগত উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তর।তারা বিভিন্ন তথ্য ও প্রতীক পরিচালনায় আরও বেশী সক্ষম। তার বীজগাণিতিক চিহ্ন, অতিরিক্ত স্থূলজ স্থান, রূপক ব্যবহার করতে পারে এবং যেটা আছে তার থেকেও বেশী যেটা হতে পারে সেটা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে পারে।তারা কৃতকর্মের সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনা করতে পারে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে যুক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানও করতে পারে।

জ্ঞানগত বিকাশে সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা কি?

চিন্তা, ভাষা, এবং যুক্তি এই মানসিক প্রক্রিয়গুলি বিকশিত হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে যা সংস্কৃতি ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত।

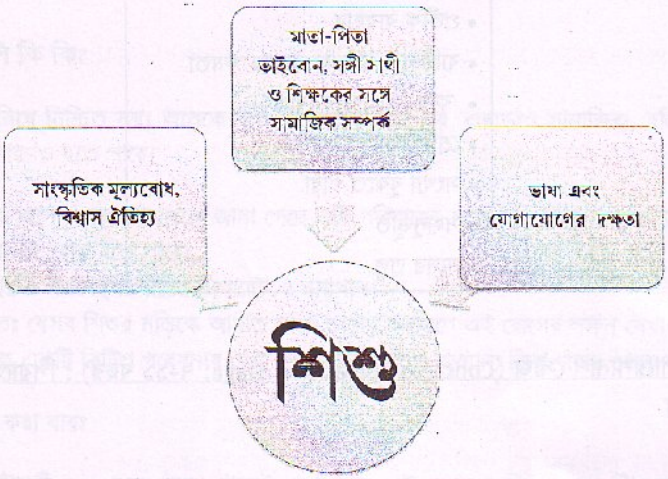

শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে তার বাড়ি ও স্কুলের প্রভাব কি কি?

- প্রথম কিছু মাসে শিশু সংবেদনশীল উদ্দীপনা পায়, কিন্তু অতিরিক্ত উদ্দীপনা এবং বিভ্রান্তমুলক আওয়াজ এড়িয়ে চলে।
- যখন শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য নতুন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যার অন্তর্ভুক্ত হবে বই, আকর্ষণীয় বস্তু (দামী খেলনা হতে হবে তা না) এবং খেলার স্থান।
- শিশুর ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া দরকার। কারন এটি শিশুর মধ্যে একটি বিশ্বাসের অনুভূতি জাগায় যে এই পৃথিবীটা বহুত্বপূর্ণ স্থান এবং এর সাথে সাথে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে।
- পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্প্রদানের জন্য শিশুকে কিছু খেলনা দেওয়া দরকার যেগুলি নাড়ানো যায় , চালনা করা যায়, গঠন করা যায়। তাদের শেখাতে হবে দরজার হাতল দিয়ে কিভাবে দরজা খোলা হয়, বোতাম টিপে আলো জ্বালানো হয়, কল খুললে স্নানের জল পাওয়া যায় ইত্যাদি।
- শিশুকে সারাদিন সংকীর্ণ স্থানে, ছোট ঘরে আবদ্ধ না রেখে তার নিজের মত অনুসন্ধানের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।
- শিশুর সাথে কথা বলাটা আবশ্যক। তারা রেডিও বা টেলিভিশণ শুনে ভাষা শিখতে পারে না। এক্ষেত্রে বড়দের সাথে কথোপকথন করা দারকার।
- শুরু থেকেই শিশুদের সামনে সস্নেহে যত্ন সহকারে পড়া উচিত। জোরে পড়া ও গল্প বলা শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক। ,
- শিক্ষক শিশুদের মধ্যে কিছু মৌলিক দক্ষতা যেমনবস্তুকে তার রং বা ,তুলনা করা ,কোনকিছু আখ্যা দেওয়া - বস্তুকে ,আকার অনুযায়ী সাজানো ক্রমানুসারে সাজানো , ক্রিয়ার ফলাফল লক্ষ্য করা ইত্যাদি অর্জনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।
- নতুন কলাকৌশল প্রয়োগের করে শিশুকে সেগুলি অনুশীলন ও অন্বেষণের সুযোগ দিতে হবে।
- চরম পরিস্থিতি ছাড়া খুব দরকার না হলে শিশুকে কোনো শাস্তি দেওয়া উচিত না।

মানসিক-সামাজিক বিকাশঃ

যেরকম শিশুর দৈহিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপগুলি লক্ষ্য করা সহজসাধ্য সেরকমই শিশুর অন্যান্য বিকাশজনিত পর্যায়গুলি যেমন আবেগীয় বিকাশ, নৈতিক বিকাশ ইত্যাদিও লক্ষনীয় বিষয়।

প্রাথমিক আবেগগুলি কি কি?

কান্না (Cry) :

শিশুর চাহিদা জাহির করার জন্য সবথেকে শক্তিশালী উপায় হল কান্না। গবেষককারীরা কান্নাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন (Wolf, 1969)।

- ক্ষুধাজনিত কান্নাঃ ছন্দোময় কান্না
- রাগজনিত কান্নাঃ ছন্দোময় কান্নার মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়, এক্ষেত্রে ভোকাল কর্ডে প্রচুর বাতাস ধাক্কা খায়।
- ব্যথাজনিত কান্নাঃ ফোঁপানো ছাড়াই হটাৎ খুব জোরে, কখনও আবার নিঃশ্বাস ধরে রেখে কান্না।
- বিরক্তিজনিত কান্নাঃ অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস না ধরে রেখে তিন চারবার একটানা কান্না।
- প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত শিশুর তুচ্ছ বিষয়ে অকারন ব্যতিব্যস্ত হওয়াকে দেরিতে গুরুত্ব দিলে তার মধ্যে সেটি কমে যায় কারন শিশু নিজে থেকেই শিখে যায় কিভাবে ছোটখাটো অসুবিধাকে নিজেই সামলাবে (Hubbard & van IJzendoorn, 1991) । কিন্তু যদি বাবা মা সবসময় শিশুর কান্নাকে গুরুত্ব না দিয়ে খুব রেগে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাহলে সেটি অনেকসময় সামলানো কষ্টকর হয়ে ওঠে এবং বার বার শিশুর এই রেগে যাওয়াটা পরবর্তীকালে তার নিজের আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করে (R.A Thompson, 1991)।

হাসি (Smiling):

- রেম (অনবরত চোখের পাতা নাড়া) ঘুমের সময় শিশুর অনৈচ্ছিক হাসির কারন হল সাব করটিকাল স্নায়ুতন্ত্র।
- কিছু সামান্য সংবেদন দ্বারা যেমন আস্তে করে ঝাঁকিয়ে, ত্বকে ফুঁ দিয়ে এবং পরবর্তীকালে খাওয়ানোর মাধ্যমেও শিশুকে হাসানো সম্ভব।
- ৩ সপ্তাহে - এই সময় শিশু শুশ্রুষাকারীর মাথা নড়ানো ও গলার আওয়াজে মনোযোগী ও সতর্ক হয়ে গিয়ে হাসতে শুরু করে।
- ১ মাসে- এই সময়ে শিশুকে বার বার হাসতে দেখা যায় এবং সেটা অনেকটা সামাজিক।
- ২ মাসে- এই সময় থেকে শিশু চেনা মুখ দেখে হাসতে শুরু করে।
- ৪ মাসে- শিশুকে কাতুকুতু দিলে বা আদর করলে সে জোরে জোরে হাসতে শুরু করে এই সময় থেকে।
- পরবর্তী ৬ মাস- আনন্দ, বিস্ময়, দুঃখ, বিতৃষ্ণা, রাগ ও ভয় ইত্যাদি আরও বিভিন্ন ধরনের আবেগ বিকাশলাভ করে।
- ১৫-২৪ মাসের মধ্যে- এই সময়ে শিশুর মধ্যে নিজের উন্নতিসাধনের উপলব্ধি এবং লজ্জা, সহানুভূতি, হিংসা ইত্যাদি আত্মসচেতনতার আবেগগুলি বিকাশলাভ করে।

- ৩ বছরে- এই বয়সে শিশুরা আত্মসচেতনতার সাথে সাথে সামাজিক মান, নিয়মকানুন, লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ফলে তারা গর্ব, লজ্জা ও অনুশোচনা এইসব আত্ম-মূল্যায়নকারী আবেগও প্রকাশ করতে পারে।

রাগ(Aggression) :

সহায়ককারী রাগ (Instrumental Aggression): রনিত যখন স্নেহলের থেকে তার খেলনাটি কেড়ে নেয় তখন তার স্নেহালকে আঘাত করার কোন উদ্দেশ্য থাকে না ,তার উদ্দেশ্য থাকে শুধু খেলনাটি নেওয়ার। অভিভাবক ও শিক্ষকরা মাঝে মাঝেই শিশুদের এই আক্রমণাত্মক আচরণ নিয়ন্ত্রণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যখন আক্রমণাত্মক আচরণ শুধুমাত্র কোন উদ্দেশ্য পূরনের জন্য হয়ে থাকে তখন তাকে সহায়ককারী রাগ বলা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে তারা এই ধরনের আচরণ করে কারন তাদের চাহিদা পূরনের অন্য আর কোন রাস্তা জানা নেই।

প্রতীয়মান রাগ (Overt Aggression): যদি রেমা তার ঠাকুমাকে তাকে টিভি দেখতে না দেওয়ার জন্য আঘাত করে তাহলে সেটি একটি প্রতীয়মান রাগের উদাহরণ।

- ২-৪ বছরের মধ্যে- যেহেতু এই বয়সের শিশুদের মধ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রণ বিকাশ লাভ করে এবং তারা মুখে সবকিছু প্রকাশ করতে পারে তাই তাদের দৈহিক আক্রমনের থেকে মৌখিক আক্রমণ করতেই দেখা যায়।

  যেসব শিশুরা খেলনার জিনিস কেড়ে নিতে অভ্যস্ত তারা ৫ বছর বয়সে আরও আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে।

- ৬ বা ৭ বছরের পর- এই বয়সের পর থেকে শিশুদের কম আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায় যেহেতু তারা আরও বেশি সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

খারাপ মেজাজ, মানসিক চাপ, পারিবারিক অবস্থা , কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, মায়ের স্নেহের অভাব, সামাজিক সমর্থন, প্রাপ্তবয়স্কদের আক্রমনের স্বীকার হওয়া, প্রতিবেশীদের হিংস্রতা ও অস্থায়ী সঙ্গীসাথী এই সবকিছু মিলিয়েই আক্রমণাত্মক আচরনের জন্ম।

শিশুর রাগ নিয়ন্ত্রণের স্বাস্থ্যকর পদক্ষেপগুলি কি কি?

- শিশুকে তাৎক্ষনিক শান্ত করার জন্য কিছু কৌশল শেখাতে হবে, যেমন- উল্টোভাবে ১ থেকে ১০ গোনা , এমন কিছু করা যেগুলি প্রতিক্রিয়া ধীরে হয় যেমন- জল খাওয়া, ৩ বার গভীর নিঃশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া।
- বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতেও যেমন কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে, গান শুনে, নাচ করে, সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধগ্রহণ করে শিশুর জমে থাকা রাগ কিভাবে ভিতর থেকে অপসারিত করা যায় তা শিশুকে শেখান যেতে পারে।
- শিশুকে অনেক সময় যে ব্যক্তির উপর সে রেগে আছে তার ছবি এঁকে বা তার পুতুল বানিয়ে তাকে আঘাত করতে বলা হয়, এছাড়া যেসব জিনিষের উপর তার রাগ সেগুলি ছিড়ে ফেলা, নষ্ট করে দেওয়া এইসব আবেগমুক্তিকর প্রক্রিয়া দিয়েও শিশুর রাগ সামলানো যেতে পারে।

সমমর্মিতা বা সমানুভূতি (Empathy):

এটি হল সেই ধরনের মনোভাব বা অনুভূতি যেভাবে অন্য কেউ অনুভব করে ঠিক সেরকম অনুভব করা বা কোন পরিস্থিতিতে যেভাবে অনুভব করা উচিত সেইরকমই অনুভব করা ও সেইমত আচরণ করা. মোটামুটি ২ বছর বয়সে শিশুর মধ্যে এই অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি আরও বাড়তে থাকে (Eisenberg,2000; Eisenberg & Fabes, 1998)। শিশুর মধ্যে এই অনুভূতি বিকাশলাভ করা খুব জরুরী কারন এটি শিশুকে অসামাজিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং অনুকূল সামাজিক কাজকর্ম করতে উন্নীত করে

ভয় বা ভীতি (Fearfulness):

বাল্যকাল হল সেই সময়কাল যখন শিশুর কোমল মনে অনেকরকম ভয় কর্তৃত্ব করে। এই সবরকম ভয়ের মূলে আছে অসহায়তা এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করতে না পারা। কল্পিত ভয় থেকে শুরু করে বাস্তবে নিজেকে মূল্যায়ন করার ভয় অবধি এর পরিসর।

টেবিল - ২ ভীতিবিকাশলাভের বিভিন্ন পর্যায়

বয়স	ভয়
০-৬ মাস	অবলম্বনের অভাব, তীব্র আওয়াজ
৭-১২ মাস	অপরিচিত ব্যক্তি, উচ্চতা, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বস্তু
১ বছর	বাবা মায়ের থেকে আলাদা থাকা, টয়লেট, আঘাত, অপরিচিত ব্যক্তি
২ বছর	তীব্র আওয়াজ, প্রাণী, অন্ধকার ঘর, বাবা মায়ের থেকে দূরত্ব, বড় আকারের বস্তু বা যে ব্যক্তিগত পরিবেশের পরিবর্তন , অচেনা সঙ্গী
৩ বছর	মুখোশ, অন্ধকার, জীবজন্তু, বাবা মায়ের থেকে দূরত্ব
৪ বছর	অন্ধকার, জীবজন্তু, বাবা মায়ের থেকে দূরত্ব, আওয়াজ
৫ বছর	জীবজন্তু, খারাপ লোক, বাবা মায়ের থেকে দূরত্ব, দৈহিক কোন আঘাত
৬ বছর	অলৌকিক সত্তা, দৈহিক কোন আঘাত, অন্ধকার, ঘুম, একা থাকা
৭-৮ বছর	অলৌকিক সত্তা,অন্ধকার, সংবাদ মাধ্যমের ঘটনা, একা থাকা, দৈহিক কোন আঘাত
৯-১২ বছর	স্কুলের পরীক্ষা, স্কুলের সম্পাদিত কার্য, দৈহিক কোন আঘাত, দৈহিক গঠন, মৃত্যু, অন্ধকা

মানসিক মেজাজ কাকে বলে?

মানসিক মেজাজ হল জন্মগত চারিত্রিক অংশ যাকে পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী রূপায়ন করা যায়। মানসিক মেজাজ সম্বন্ধে বোঝা ও জানাটা দরকার কারন এটি আপনাকে অভিভাবক হিসেবে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই শিশুর সাথে আপনার সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। ৯ রকমের মেজাজগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল কার্যকলাপের স্তর, নিয়মানুবর্তিতা, পদ্ধতি / প্রত্যাহার, অভিযোজন, অধ্যবসায়, তীব্রতা,কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সংবেদনের সীমা এবং সাময়িক মানসিক অবস্থা।

মানসিক মেজাজ সম্বন্ধে জানা জরুরী কেন?

মনে করা হয় নাছোড়বান্দা শিশুরা সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে অসামর্থ্য। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে তারা সবসময় সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না তা নয় এটা পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। সুস্থ অভিযোজনের মূলে আছে মানিয়ে নেওয়ার গুন সেটা হল শিশুর মেজাজের সাথে পরিবেশের চাহিদা তথা অভিভাবকের মেজাজের সঠিক মেলবন্ধন।যদি একজন কর্মক্ষম শিশুকে অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রাখা হয় বা কোন ধীর স্থির শিশুকে হঠাৎ করে কোন নতুন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয় এবং এটা আশা করা হয় যে তারা তৎক্ষনাত প্রতিক্রিয়া করবে তাহলে সেটা অনুপযুক্ত এবং তারা হয়ত তাদের আবেগগুলি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। শিশুর সাথে তার পরিবেশের যত ভাল মেলবন্ধন হবে ততবেশী তার মধ্যে আবেগীয় অভিযোজন ঘটবে।

টেবিল- ৩ তিন ধরনের মেজাজগত নমুনা (নিউ ইয়র্ক লঙ্গিচুডিনাল স্টাডি অনুযায়ী)

সাবলীল শিশু (Easy Child)	নাছোড়বান্দা শিশু (Difficult Child)	স্থির থেকে উত্তেজিত শিশু (Slow-to-warm-up Child)
• অল্প থেকে মাঝারি তীব্রতায় প্রাক্ষতিক (mood) পরিবর্তন • নতুনত্ব ও পরিবর্তনে সাড়া দেয় • শীঘ্র প্রতিদিনের খাওয়া ও ঘুমানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে • নতুন খাবার সহজেই গ্রহন করে • অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে হাসে • নতুন পরিস্থিতিতে সহজে মানিয়ে নিতে পারে • বেশীরভাগ সময় হৈচৈ করে না নৈরাশ্যবোধকে মেনে নেয়। • নতুন খেলার নতুন নিয়ম ও রুটিনকে সহজে শিখে নেয়।	• বেশীরভাগ সময়ে খারাপ মেজাজে থাকে; প্রায় জোরে কাঁদে ও হাসে। • নতুনত্ব ও পরিবর্তনকে খুব একটা সাড়া দেয় না • খাওয়া ও ঘুমানোয় নিয়ম মানে না। • অচেনা লোকের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে • নতুন পরিস্থিতিতে মানাতে সময় লাগে • বিরক্তি ও নৈরাশ্য তে খুব মেজাজ সহকারে প্রতিক্রিয়া করে। • নতুন নিয়মে নিজেকে মানাতে সময় লাগে	• খারাপ ভাল দুটো মেজাজেই অল্প মাত্রায় প্রতিক্রিয়া করে • নতুনত্ব ও পরিবর্তনে খুব ধীরে সাড়া দেয়। • সাবলীল শিশুদের থেকে কম ও নাছোড়বান্দা শিশুদের থেকে বেশী নিয়ম মেনে খায় ও ঘুমায় • নতুন উদ্দীপকে মোটামুটি কম নেতিবাচকতার সাথে সাড়া দেয় • বারবার নতুন উদ্দীপক দেওয়া হলে সে আস্তে আস্তে সেটকে পছন্দ করতে আরম্ভ করে

শিশুর আবেগমূলক বিকাশে তার পরিবার ও স্কুলের কি কি ভূমিকা আছে ?

- শিশুর লালন পালনে বাবা মা দুজনেরই অংশগ্রহণই দরকার। যেমন- একটি শিশু চায় তার বাবা মা দুজনেই তাকে সঙ্গ দিক ও তাকে ভালবাসুক।
- শিশু ও শুশ্রুষাকারীর মানসিক অবস্থা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এঁকে বলা হয় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ। উদাহরণস্বরূপ কোন মা যদি তার শিশুর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে ও প্রতিক্রিয়া না করে তাহলে শিশুটি আর হাসবে না। আরও জটিল পরিস্থিতিতে যখন কোন মা হতাশায় ভোগে তখন সেটিও শিশুর ভাল থাকাকে প্রভাবিত করতে পারে। ঠিক একই কারনে শিশুর মানসিক অথবা তার মা বা শুশ্রুষাকারীর মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।
- প্রথম এক বছরের দ্বিতীয় ভাগে শিশুদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে বা অজানা জায়গা নিয়ে একটা অস্থিরতা বা উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায় যেটা খুবই প্রচলিত আর সেটা বিচ্ছিন্নতার উদ্বেগ (Separation Anxiety)বা বেদনা (Distress) থেকে জন্ম নেয় যখন শিশুটিকে তার পরিচিত শুশ্রুষাকারী সেই পরিস্থিতিতে একা ছেড়ে দেয়। এগুলি মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে স্বভাবিক ব্যাপার কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে তখনই যখন এগুলি একটা বয়সের পরেও শিশুর মধ্যে থেকে যায় এমনকি সে স্কুলে যেতে চায় না বা আরও অন্যান্য এরকম ধরনের ব্যবহার তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।
- ভাই বোনের মধ্যে ভাল সম্পর্ক তাদের পরবর্তী জীবনের সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ধারণ করে তারা শেখে যে তাদের মধ্যে যদি কোন ঝগড়া হয় তাহলে তা সাময়িক এর জন্য তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে না। তারা বুঝতে পারে যে তাদের সম্পর্ক কখনও ফলপ্রসূ আবার কখন চাহিদাপূর্ণও হতে পারে তারা সবকিছু ভাগ করে নিতে ও নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতেও শেখানো হয়।পাশাপাশি এটাও বুঝতে পারে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে গেলে অনেকসময় বোঝাপড়াও করে নিতে হয়।
- যে শিশুদের সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা আছে তারা স্কুলেও ভাল পড়াশোনা করে, বন্ধুবান্ধব ও বড়দের সাথে তাদের সম্পর্কও ভাল হয়। যেহেতু শিশুরা বেশীরভাগ সময়ই স্কুলে কাটায় তাই সেখানেই স্কুলের পড়াশোনার সাথে সাথে তাদের অন্যান্য সামাজিক ও আবেগজনিত উন্নতী ও বিকাশসাধনও ঘটে।
- ক্লাসরুমে শিক্ষককে সব শিশুকে সমান চোখে এবং সম্মানের সাথে দেখা দরকার, তাতে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয় ফলে তারা শিক্ষককেও সম্মান করতে পারে , ও শিক্ষকের প্রতি তাদের একটা বিশ্বাসও গড়ে ওঠে

সামাজিক বিকাশঃ

সামাজিক বিকাশ জন্ম থেকেই শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি শিশুর অন্যান্য বিকাশকেও প্রভাবিত করে। শিশুর চারপাশের মানুষজনের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখার ক্ষমতা তার অন্যান্য অনেক দিকগুলিকে প্রভাবিত করে, যেমন- ছোট বয়সে নতুন শব্দ শেখা, হাই স্কুলে গিয়ে সঙ্গীসাথীদের সাথে সম্পর্ক, এছাড়া প্রাপ্তবয়স্ককালীন সময়ে জীবনের বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়া প্রভৃতি।

জন্ম থেকে ৩ মাস:

প্রথম ৩ মাসে শিশুরা নিজেদের ও তার চারপাশের মানুষজনকে জানে। তার এই জানা ও চেনার অংশগুলি হল ঃ

- নিজের হাত দেখা ও আঙুল চোষে ।
- অভিভাবক বা শুশ্রুষাকারী তার দেহের যে অংশ স্পর্শ করে সেগুলি লক্ষ্য করে।
- তার পা, হাত কিভাবে সংযুক্ত তা বোঝে।
- সে উপলব্ধি করে তার চারপাশে যারা আছে তাদের থেকে সে আলাদা।
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তাদের শিখন প্রক্রিয়া আরামদায়ক ও প্রশমিত হয়।
- সামাজিক উদ্দীপক দেখে তারা খুশি হয় ও হাসে।
- তাকে স্পর্শ করলে প্রতিক্রিয়া করে।

৩ - ৬ মাসঃ

- সমাজের সাথে মেলামেশা আরও বাড়তে থাকে। এই সময় বেশিরভাগ শিশুরা -
- প্রতিক্রিয়া করে যখন তার নাম ধরে ডাকা হয়।
- হাসে।
- উচ্চহাস্য করে।

৬-৯ মাসঃ

- যেহেতু তারা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তারা চেনা মানুষজনকেই বেশী পছন্দ করে। এই বয়সে তারা বিভিন্ন ধরনের আবেগ প্রকাশ করে, যেমন- আনন্দ, দুঃখ , ভয়, ও রাগ।
- পরিচিত পরিবারের লোক , বন্ধুবান্ধবদের থেকে অচেনা ব্যক্তিদের আলাদা করতে পারে।
- কোন খেলনা কেড়ে নেওয়া হলে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা যায়।
- মুখের অঙ্গভঙ্গি ও কথাতে তারা প্রতিক্রিয়া করে।

৯-১২ মাসঃ

যেহেতু এই বয়সে তারা আরও বেশী সামাজিক হয়ে ওঠে তারা অন্যকে নকলও করতে পারে। তাদের মধ্যে আত্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বেড়ে যায়।এই সময় শিশুরা:

- কাপ ধরে কারুর সাহায্য নিয়ে খেতে পারে।
- সহজ কাজ অনুকরণ করতে পারে।
- ছোট ছোট কামড় দিয়ে খাবার খেতে পারে।
- অভিভাবক বা শুশ্রূষাকারীথেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিলে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

১-২ বছরঃ

এই ১ থেকে ২ বছর বয়সে শিশুরা অনেক ধরনের মানুষজনের সাথে মেশার সুযোগ পায়। তারা বেশী করে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে।এই বয়সের বেশীরভাগ শিশুরাঃ

- আয়না দেখে নিজের প্রতিচ্ছবি চিনতে পারে।
- খেলাধুলা করতে শুরু করে।
- নিজেরা স্বাধীনভাবে খেলে, অনেকসময় বড়দেরকে নকল করতেও দেখা যায়।
- কোনকিছু অর্জন করতে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে।
- রাগ, হতাশা ইত্যাদি নেতিবাচক আবেগগুলি প্রকাশ করে।
- নিজের বক্তব্য জাহির করতে পারে ও অনেকসময় অন্যদের কার্যকলাপ চালনা করার চেস্টা করে।

২-৩ বছরঃ

এই সময় তারা আরও বেশী সৃষ্টিশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ২ বছরের বেশীরভাগ শিশুরাইঃ

- সে ছেলে না মেয়ে এই ব্যাপারে সচেতন হয়।।
- নিজেরাই জামা খুলতে ও পরতে পারে।
- খেলনা, খাবার, বা অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের পছন্দ অপছন্দ জাহির করতে পারে।
- বড়দের না বলতে শুরু করে।
- অন্য শিশুদের দেখতে ও তাদের সাথে খেলতে পছন্দ করে।
- নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে।
- খেলার সময় বিভিন্ন বস্তুকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে।
- মানসিক অবস্থার খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন দেখা যায়।

৩-৪ বছর

৩ বছরের শিশুদের মধ্যে দৈহিক কার্যকলাপ করার ক্ষমতা আরও বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে নিজের উপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। এই বয়সের শিশুরা:

- নির্দেশ অনুসরন করে।
- ছোট ছোট কাজ অল্প সাহায্য নিয়ে বা অনেক সময় একাই করতে পারে।
- অন্য শিশুদের সাথে তার খেলার জিনিস ভাগ করে নেয়।
- বিভিন্ন খেলা তৈরি করে অন্যান্য শিশুদের অংশগ্রহণ করতে বলে।
- অনেক সময় সাজানো খেলাতেও যোগদান করে।

৪-৫ বছর:

৪ বছর বয়সে শিশু নিজস্ব স্বত্বা সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়। যেহেতু তাদের দৈহিক ক্ষমতা বেড়ে যায় তাই নিজেরাই অনুসন্ধান করতে পারে এবং এটি নিজেদের প্রতি বিশ্বাস গঠনে সহযোগী।এই বয়সের বেশিরভাগ শিশুঃ

- ভাল ও খারাপ আচরনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে।
- অন্যান্য শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারে।
- নিজেদেরকে অন্য শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে তুলনা করতে পারে।
- অন্য ব্যক্তির অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন হয়
- অন্য শিশুদের সাথে নাটকীয়, কাল্পনিক খেলা করতে ভালবাসে
- প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলতেও আনন্দ পায়।

৬-৮ বছরঃ

একজন ভাল অধিনায়ক হওয়ার মত গুন তাদের মধ্যে দেখা যায়। শিশুর জীবনে তার সঙ্গীসাথীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।এই বয়সে শিশুরা ঃ

- এদের মধ্যে সবসময় প্রথম হতে, সব থেকে বড় হওয়ার বা জেতার ইচ্ছা দেখা যায়।
- তার থেকে কম বয়সের শিশুদের প্রতি একটা প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব গোড়ে ওঠে।

৯-১২ বছরঃ

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় কারন এই বয়সে শিশু বয়ঃসন্ধিতে পদক্ষেপ করবে। এই বয়সে শিশুরাঃ

- তার জীবনে যে ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে ও এমনকি অন্যের জন্য নিজের ইচ্ছা চাহিদাকেও বিসর্জন দিতে পারে।
- নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা না করতে শেখে।

কিভাবে একজন অভিভাবক তার শিশুকে সামাজিক ও আবেগজনিত দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে পারে?

প্রথম কিছু বছরে শিশুকে তার শুশ্রূশাকারীর উপর বিশ্বাস করতে শেখনোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তারপর বাবা মা তার শিশুকে সেইসব ব্যক্তির উপর ভরসা করতে শেখায় যারা তার অনেক কাছের। এরপর শিশু যত বড় হয় বাবা মা তাকে নিয়ম কানুন গুলো শেখায় যদি শিশু তার আশানুরূপ আচরণগুলি জানে এবং এটাও জানতে শেখে কোন নিয়ম ভাঙলে তার ফল কি হতে পারে তবে সে বুঝতে পারবে যে এই পৃথিবীটি সুশৃঙ্খল, এরফলে শিশুর মধ্যে একটা আত্ম নিয়ন্ত্রণের বোধ বিকাশলাভ করবে।

শিশুর মধ্যে সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ সাধনের জন্য বাবা মাকে তার শিশুকে অন্যদের সাথে খেলার, নিজের ক্ষমতা গুলি অনুসন্ধান করার, নিজের অনুভূতি গুলি প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। যখন কোন সীমার

মধ্যে থাকর পরিস্থিতি আসে তখন শিশুকে নিজেদের পছন্দটা বেছে নিতে বলাটাই ভাল, যেমন- তুমি আজ রাতের খাবারে ভাত না রুটি খাবে ? অথবা তুমি আজ লাল না সবুজ জামা পরবে ? - শিশুকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার জন্য বাবা মাকে এই ধরনের প্রশ্ন শিশুদের করা দারকার।

বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজের আবেগের সঠিক বহিঃপ্রকাশ করবে তা শিশুকে শেখানো জরুরী। যখন শিশুর মাথায় রাগ বা হিংসা ঘোরাফেরা করে তখন শিশুকে অসঙ্গত ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকে নিজের অনুভূতিগুলি প্রকাশ করতে বলতে হবে। শিশুর মধ্যে যখন অসঙ্গত আচরন যেমন-কাউকে মারা, চিৎকার করা ইত্যাদি দেখা যায় তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার এই আচরণটি গ্রহনযোগ্য নয় এবং এর পাশাপাশি বিকল্প আচরণটিও শিখিয়ে দিতে হবে। শিশুর থেকে যে ধরনের আচরণ আশা করা যায় হয় বাবা মায়ের উচিত তার সামনেও একি রকম আচরণ করা।

নৈতিক বিকাশঃ

নৈতিক বিকাশ কাকে বলে ?

নৈতিক বিকাশ হল একটি পরিবর্তনশীল ও ক্রমবিবর্তিত বিষয় যেখানে নৈতিকতার বিভিন্ন দিকগুলি শেখা যায় এবং এই প্রক্রিয়া ছোটবেলা থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এই ধরনের বিকাশের ক্ষেত্রে নৈতিকতা হল ন্যায়বিচার, সামাজিক কল্যাণ ও অধিকারের দিক থেকে আচরনের কিছু নীতি ও আদর্শ।

নৈতিকতার তিনটি দিক আছে - বিশ্বাস, আবেগ ও নৈতিক আচরণ অর্থাৎ কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারনা বা বিশ্বাস (ঠিক বা ভুল), কোন বিষয়ে জড়িত আবেগ এবং সর্বশেষ নৈতিক বা অনৈতিকভাবে আচরণ করা একজন ব্যক্তির জীবনের যেকোনো সময়ে তার নীতিগত ধারনা বা আবেগের পরিবর্তন হতে পারে কারন তার বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে এগুলি আরও উন্নত হয়।

কোন কোন বিষয় নৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করে ?

- শুশ্রূষাকারীও সঙ্গীসাথীদের সাথে শিশুর মেলামেশা তার নীতিগত ধারনা ও আচরনকে প্রভাবিত করে। গবেষকরা শিশুর নৈতিক বিকাশের উপর পারস্পরিক মেলামেশার প্রভাবকে দুটি মূল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত দেখেছেন: সামাজিকতা ও কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ধারনা। শিশুর মধ্যে যেসব কারনে নৈতিকতা গড়ে ওঠে সেগুলি হল:
- জিনগত প্রভাব (অভিভাবক সমাজবিরোধী বা মদ্যপ)
- শিশুর মানসিক মেজাজ
- অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তির সাথে শিশুর মেলামেশা ও যুক্ত থাকা।
- পিতামাতার সন্তান পালনের ধরন ও নিয়মানুবর্তিতা
- ইতি বাচক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের অভাব ও নেতিবাচক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের উপস্থিতি।
- সঙ্গীসাথীদের সাথে মেলামেশা
- বাড়ির পরিবেশ
- স্কুল ও শিক্ষকের ভূমিকা

- সংস্কৃতি ও ধর্ম

নৈতিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় গুলি কি কি?

লোরেন্স কোহলবারগ (Lawrence Kohlberg) নৈতিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলেছেন যেটা মূলত জিন পিয়াজের (Jean Piaget) ধারনা ও যিনি নৈতিক বিকাশের সাথে জ্ঞানমূলক বিকাশকে সংযুক্ত করেছেন। কোহলবারগের ৬ টি স্তর প্রধানত ৩ টি লেভেলে বিভক্ত ও প্রত্যেকটি লেভেলে ২ টি করে পর্যায় আছে।

লেভেল ১ (প্রি-কনভেনশানাল)

১। ওবেডিয়েন্ট ও পানিশমেন্ট অরিয়েন্টেশন (Obediant and Punishment Orientation)

এর প্রধান বিষয়বস্তু হল কিভাবে শাস্ত এড়িয়ে চলা যায় ? শিশু এমন আচরণ করে যাতে সে শাস্তি এড়িয়ে চলে। উদাহরণ- আমি যদি চুপচাপ খেয়ে নিই তাহলে মা আমায় মারবে না।

2। সেলফ- ইনটেরেস্ট অরিয়েন্টেশন (Self- interest Orientation)

এই স্তরের মূল বিষয় আমার জন্য কি আছে। শিশু চিন্তা করে তার জন্য লাভজনক কোনটা । উদাহরণ- আমি যদি চুপচাপ খেয়ে নিই মা আমায় পার্কে নিয়ে যাবে।

লেভেল ২ (কনভেনশানাল)

৩। ইন্টারপারসোনাল অ্যাকর্ড অ্যান্ড কনফরমিটি (Interpersonal Accord & Conformity)

এই পর্যায়ে শিশুরা সামাজিক নীতি মেনে চলার চেষ্টা করে। এই সময় সাধারণত তারা স্কুলে যায় ও এমনভাবে চলার চেষ্টা করে যাতে সবাই ভাল ছেলে বা মেয়ের আখ্যা দেয়। তাহলে দেখা জাছে এই সময় সামাজিক অনুমোদন শিশুর নৈতিক আচরণ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন- আমি রোজ বাড়ির কাজ করে নিয়ে যাব, ক্লাসে চুপচাপ থাকব তাহলে শিক্ষক আমায় ভাল মেয়ে বলবে।

৪। অথরিটি অ্যান্ড সোসাল অর্ডার মেন্টেনিং অরিয়েন্টেশন (Authority and Social-order Maintaining Orientation - Law and Order Morality)

এই স্তরে শিশুরা সামাজিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সচেতন থাকে অর্থাৎ সবাইকে আইন কানুন মেনে চলতে হয় ও কেউ যদি তা অমান্য করে তবে তাকে কারাবাসও করতে হতে পারে। তাদের মধ্যে কিন্তু নিজের নীতিগত বিশ্বাস পরিবর্তনের নমনীয়তা থাকে না কারন তাদের কাছে এসবের অন্তর্নিহিত মানে স্পষ্ট নয় । যেমন- তারা মনে করে যদি চুরি করা অপরাধ হয় তাহলে কেউ যদি তার বাচ্চার ওষুধ কেনার জন্যও চুরি করে সেটাও সমান অপরাধ।

লেভেল ৩ (পোস্ট- কনভেনশানাল)

এটা দেখা গেছে শিশু প্রত্যেকটি স্তরে যা শেখে বা বোঝে পরবর্তী স্তরেও তা বজায় থাকে, কিন্তু পরবর্তী স্তরে তদের যুক্তি আরও পরিপক্ক (mature) হয়ে ওঠে। অনেকে বিভিন্ন পারিবারিক সীমাবদ্ধতার জন্য নৈতিক বিকাশের এই পরিপক্কতা বা পরিনমনের স্তরে পৌঁছতে পারে না।

৫। সোসাল কন্ট্রাক্ট অরিয়েন্টেশন (Social Contract Orientation)

কিশোর- কিশোরীরা সামাজিক জনকল্যাণ ও তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে ওঠে। তারা তাদের চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবিচারের ব্যাপারে অনেক নমনীয় হয় এবং বিভিন্ন নৈতিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ করার উপায় ও যৌক্তিকতা নিজেরাই সন্ধান করে নেয়।

৬। ইউনিভারসাল এথিকাল প্রিলিপালস (Universal Ethical Principles)

সর্বশেষে কিশোর- কিশোরীরা সার্বজনীনভাবে আইন-কানুন ও নৈতিকতার উচ্চতর স্তরে পৌঁছায়। তারা কোন কাজের নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলি মূল্যায়ন করে সেগুলির ফলাফল অনুসারে যেটা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২। ইতিবাচক অভিভাবকতা

এই অধ্যায়ে আমরা জানবো

- অভিভাবকতার ধরন
- ইতিবাচক অভিভাবকতা কাকে বলে?
- কিভাবে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় যেগুলি বিভিন্ন খারাপ সময়ে সুরক্ষা প্রদান করে

অভিভাবকতা কি?

অভিভাবকতা (বা শিশুর প্রতিপালন) হল শিশুর বাল্যকাল থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত তার দৈহিক, প্রাক্ষোভিক (emotional), সামাজিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের উন্নতিকরন ও ভরণপোষণের প্রক্রিয়া। অভিভাবকতা বলতে বোঝায় জৈবিক সম্পর্ক ছাড়াও শিশুর উন্নয়নের বিষয়।

ব্যাপক অর্থে অভিভাবকতা বলতে বোঝায়-

- শিশুর জীবনের সমস্ত বিষয়ে সার্বিক উন্নতিকরনের প্রক্রিয়া
- শিশুর প্রতিপালন প্রক্রিয়া
- এটি একপ্রকার দক্ষতা বা কুশলতা
- এই প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র বাবা মা তেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য ব্যক্তি যেমন- শুশ্রষাকারী, শিক্ষকরাও এই ভূমিকা পালন করে

অভিভাবকতা কি কি ধরনের হয়?

ভিন্ন শিশু একই পরিস্থিতিতে আলাদা আলাদাভাবে আচরণ করে এর কারন হল মানসিক মেজাজ। , কিন্তু অনেক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে শিশুদের এই ভিন্ন আচরণ তার বাবা মা ও শিক্ষক , শুশ্রষাকারীদের দ্বারা প্রভাবিত । শিশুর, বাবা মায়ের শিশুর থেকে চাহিদা ও শিশুর প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে ডায়না বোমরি(Diana Baumrind) কিছু অভিভাবকতার ধরনের কথা বলেছেন।

টেবিল - ৪ অভিভাবকতার প্রকারভেদ

অভিভাবকতার ধরন	অভিভাবকতার প্রকারভেদ	মাতাপিতার চরিত্র	শিশুর চরিত্র
অথরোটেরিয়ান	অভিভাবকেরা নিয়ন্ত্রন ও বাধ্যতামুলক আচরণে জোর দেয় তারা তাদের শিশুদের কিছু নিয়ম তৈরি করে ও সেগুলি মানতে বাধ্য করে ও না মানলে শাস্তিও দিয়ে থাকে।	অন্যান্য বাবা মায়ের থেকে কম স্নেহপরায়ণ ও বিচ্ছিন্ন ধরণের।	শিশুরা অবিশ্বাসী, বিচ্ছিন্ন ও অসন্তুষ্ট হয় ।
পারমিসিভ	এরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রনে বিশ্বাসী। তারা শিশুদের নিজেদের মত নিয়ম বানাতে ও ভাঙতে অনুমতি দেয়	স্নেহপরায়ণ, নিয়ন্ত্রনহীন, চাহিদাবিহীন ।	অপরিপক্ক, নিজেকে নিয়ন্ত্রনে অক্ষম, কম অনুসন্ধানাত্মক ।
আথরিটেটিভ	এরা শিশুর নিজস্বতাকে মুল্য দেয় কিন্তু সামাজিক সীমাবদ্ধতাকেও গুরুত্ব দেয়। শিশুর নিজস্ব স্বাধীনতাকে যেমন সম্মান করে তেমনই শিশুর পথপ্রদর্শক হিসেবেও কাজ করে।	স্নেহপরায়ণ ও শিশুর বক্তব্য মেনে নেয় কিন্তু আবার ভাল ব্যবহারও শিশুর থেকে আশা করে।	আত্মনির্ভরশীল, জিদপূর্ণ, অনুসন্ধানাত্মক, তৃপ্ত।
আনইনভোল্ভড	এই অভিভাবকরা শিশুর থেকে নিজেদের ইচ্ছা, চাহিদা, হতাশাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।	হতাশ, অসন্তুষ্ট।	আচরণগত ব্যাধি দেখা যেতে পারে।

আপনি কোন ধরনের অভিভাবক?

- নারসিসিস্টিক প্যারেনটিং (Narcissistic Parenting): অভিভাবকরা নিজেদের চাহিদাকেই বেশী গুরুত্ব দেয়। শিশুরা তাদের ব্যক্তিত্বেরই সংযোজিত অংশ ; তারা নিজেদের স্বপ্ন পুরনের জন্য তাদের শিশুদের ব্যবহার করে।
- স্লো প্যারেনটিং (Slow Parenting): শিশুদের ইচ্ছা চাহিদা গুলি বিকাশলাভ করতে পারে , শিশুরা যাতে নিজেদের মত বড় হয়ে উঠতে পারে সেই সুযোগ অভিভাবকরা তাদের দিয়ে থাকে। শিশুরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজারাই নিতে পারে।
- হেলিকপ্টার প্যারেনটিং (Helicopter Parenting): এই ক্ষেত্রে অভিভাবকরা অতিমাত্রায় সব ব্যাপারে জড়িত থাকে। শিশুরা যেসব কাজ নিজেরাই করতে পারে তার ব্যাপারেও ব্যাঘাত ঘটায় ।
- টক্সিক প্যারেনটিং (Toxic Parenting): এই ক্ষেত্রে অভিভাবকরা তাদের ভূমিকা ঠিকমত পালন করে না। শিশুরা অবহেলিত হয়, এমনকি শিশুরা অনেক সময় অবমাননার স্বীকার হয় ফলে তাদের আত্মসম্মান কমে যায়।

- স্ট্রিক্ট প্যারেনটিং (Strict parenting): এক্ষেত্রে কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিভাবকদের সব ব্যাপারে খুব বেশীমাত্রায় আশা প্রত্যাশা থাকে।
- স্পিরিচুয়াল প্যারেনটিং(Spiritual Parenting): শিশুর নিজস্বতাকে সম্মান করা হয়, শিশুরা তাদের ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা দিয়ে যাতে নিজস্ব বিশ্বাস গোড়ে তুলতে পারে সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হয়।
- আনকন্ডিশনাল প্যারেনটিং (Unconditional Prenting):অভিভাবকরা শিশুদেরকে নিঃশর্তভাবে উৎসাহ দেয়।
- অ্যাটাচমেন্ট প্যারেনটিং (Attachment Parenting): শিশু ও তার প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর মধ্যে মানসিক ও প্রাক্ষোভিক (emotional) সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা হয়।
- পজিটিভ প্যারেনটিং (Positive Parenting): এই ক্ষেত্রে শিশুকে সুস্থ সবলভাবে বিকাশলাভে নিঃশর্তভাবে সমর্থন ও পথপ্রদর্শন করা হয়।

আপনি উপরিউক্ত অভিভাবকতার ধরনগুলি থেকে নিজের পছন্দমত কোনোটা বেছে নিতে পারেন ?

পজিটিভ প্যারেনটিং (Positive Parenting): এই ধরনের অভিভাবকতায় সার্বিকভাবে যত্ন,পরিচর্যা ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে কোন দৈহিক ও মানসিক শাস্তিদান বা অবমাননা না করে শিশুকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয়।

কিন্তু পজিটিভ প্যারেনটিং মানে এই নয় যে -

- শিশু যখন যা চায় তাই করতে দেওয়া হয়।
- গণ্ডী বা পরিসীমা ঠিক করা হয়, সীমাবদ্ধতা জানানো হয়, নিয়মের মধ্যে শিশুকে বেঁধে রাখা হয়।
- শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দেওয়া।

কিভাবে অভিভাবক, শিক্ষক, শুশ্রূষাকারীরা সম্পর্ক স্থাপন করবে ?

➢ **শিশুর সঙ্গে থাকুন**

শিশুর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয়তা হল শিশুর সাথে সময় কাটানো, তার সাথে থাকা। জীবনের শুরুর দিক থেকেই শিশুর সঙ্গে থাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা শিশু ও তার শুশ্রূষাকারীর মধ্যে বন্ধন স্থাপনে কার্যকরী, এরফলে শিশু একাকীত্ব বোধ করবে না, এবং শিশুকে সব বিপদে সুরক্ষা দেওয়াটাও সম্ভবপর হবে। যে বয়সে কিশোর-কিশোরীরা স্বাধীনতা পেতে চায় এমনকি সেইসময়েও তারা সচেতন বা অচেতনভাবে তাদের অভিভাবকদের কাছে চায়। যেহেতু এই সময় তারা বিভিন্ন দৈহিক, স্নায়ু-রাসায়নিক, আবেগমূলক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় তাই তারা অনেক সময় বিভিন্ন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় যেটার বহিঃপ্রকাশ অনেকসময় বেপরোয়াভাবে হয়ে থাকে। অভিভাবক ও শুশ্রূষাকারীর চাহিদাবিহীন উপস্থিতি শিশুকে তার জীবনের সমস্ত স্তরেই সুরক্ষার অনুভূতি দান করবে যেটা তার সুরক্ষিত ও সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক।

➢ শিশুর চাহিদা পূরণ করুন

বিভিন্ন আবেগমূলক (Emotional) ও প্রেরনামুলক (Motivational) তত্ত্বানুসারে মানুষের সব আচরণ কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত, যেগুলি সূক্ষভাবে দেখলে বোঝা যাবে সেগুলি সবই প্রয়োজন ভিত্তিক, অনুরূপভাবে আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কগুলিও আমাদের চাহিদা পূরণ করে। এমনকি একটি শিশু খাবারের জন্য তার মায়ের উপর নির্ভরশীল এবং তার মাও শিশুটির প্রতি স্নেহপরায়ণ কারন শিশুটি তার মায়ের মাতৃক চাহিদাগুলি মেটায়। তাই শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যেমন- খাবারের, সংযুক্ত থাকার, সুরক্ষিত থাকার ও সম্মানের চাহিদাগুলি মেটানো জরুরী। কিন্তু সে যেন এটা না বোঝে যে সে যখন যা চাইবে তাই পাবে। এক্ষেত্রে চাহিদা মানে আবেগমূলক চাহিদা বোঝায় বস্তুবাদী নয়। শিশুরা আপনার সঙ্গ ও সংযোগিতা চায় যেটা শিশু ও আপনার মধ্যে সুরক্ষিত ও সুবন্ধন গড়ে তুলবে।

➢ আপনার কিছুটা সময় শিশুকে দিন

শৈশবে কিভাবে আপনি আপনার অবসর সময় কাটাতেন ? আপনার শিশু কিভাবে অবসর সময় কাটায়? আপনার কি মনে হয় কেন তারা এগুলি করে?

এখন বেশীরভাগ বাবা মা দুজনেই চাকরি করে ফলে শিশুদের বেশিরভাগ সময়ই কাটে পরিচারিকা, কোন ডে-কেয়ার সেন্টারে, পরিচারিকা বা তার ঠাকুমা-দাদুর সাথে।তাকে সারাদিন একা কাটানোর ফলে তার মধ্যে একাকীত্ব দেখা দেয় ও সে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। কাজ থেকে ফিরে বাবা মায়ের উচিত তার শিশুর সাথে খানিকটা ভাল সময় কাটানো, এর মানে শুধু শিশুকে তার পড়াশোনায় সাহায্য করলেই হবে না, তার সাথে এমনভাবে সময় কাটাতে হবে যেন তার চাহিদাগুলিও পূরণ হয়।শিশুর সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করার সব থেকে ভাল উপায় হল তার সাথে খেলাধুলা করা, একসাথে খাওয়া দাওয়া করা , ছুটির দিনে তাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়াও ইত্যাদিও সহায়ক।

স্কুলে শিক্ষকরাও তাদের নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে ক্লাসে পড়ানো ছাড়া শিশুদের সাথে খুব বেশী কথাবার্তা বলতে পারে না , কিন্তু পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও শিশুর সাথে কথা বলা দরকার এবং সেটা যেন গঠনমূলক হয় ।

➢ যোগাযোগব্যবস্থা :

- যোগাযোগব্যবস্থা আমাদের অনেক উদ্দেশ্য মেটায় । প্রথমত, ক্রমাগত নেতিবাচক যোগাযোগ তাদের মৌখিক বা বাচনিক দক্ষতা বাড়ায়।
- অভিভাবক ও শিক্ষক শিশুর সাথে ভালভাবে কথাবার্তা বললে শিশুকে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারে ও তার মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ গড়ে ওঠে।
- অনেকসময় শিক্ষক বা বাবা মাকে শিশুকে বলতে দেখা যায় "তোমায় এটা করতে হবে কারন আমি বলছি তাই " অথবা "তোমার যা ইচ্ছা তাই করো "। এই দুটো ধরনই শিশুর সাথে কথা বলার সঠিক ধরন নয় যখন বাবা মা বা শিক্ষক পরিষ্কারভাবে শিশুকে তাদের চিন্তাধারা ও যুক্তি বুঝিয়ে দেয়, তখন শিশু বড়দের কথা শোনে, উপরন্তু এগুলি থেকে শিশু শেখে কোন বিষয়ে কিভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।
- নিজেদের আবেগ শিশুদের কাছে প্রকাশ করাটাও একটা স্বাস্থ্যকর সংযুক্তি । এটা অনেকসময় শিশুর কাছে প্রকাশ করা দরকার যে আপনি তাকে ভালবাসেন বা তার কিছু গুন আপনার ভাল লাগে।

- শিশুর কোন আচরণ খারাপ লাগলে তাকে এটাও জানিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে যে আপনি তার আচরণকে অপছন্দ করছেন শুধু ওকে নয়।
- শিশুদেরকে বোঝাতে হবে কিভাবে নিজের মনকে জানা ও বোঝা যায়। অনেকসময় অনেক শিক্ষক ও বাবা মায়েরাই নিজেদের মনকে বুঝতে ও আবেগের সঠিক বহিঃপ্রকাশে অসুবিধা বোধ করে, তাদের ছেলেমেয়েরাও সঠিকভাবে আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না ও বিভ্রান্তিমূলক আচরণ করে।

➢ শিশুকে দেখান যে তার প্রতি আপনার ভালবাসা নিঃশর্ত

অনেক অভিভাবক তার শিশুকে বলে " তুমি যদি অঙ্কে সব থেকে বেশী নম্বর পাও তাহলে আমি এটা বা ওটা করবো তোমার জন্য "। আমরা বেশীর ভাগ সময়ই শিশুকে লক্ষ্যে বেধে দিই ও তাদের কাছে কিছু চাহিদাও রাখি। আমরা তাদের সামনে " যদি.....তাহলে....." এইসব নানা শর্তও রেখে দিই। প্রথমত, তারা ঐ সমস্ত চাহিদা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে , দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদেরকে ছোট বলে মনে করে ও এও ভাবে তারা যদি ওইসব চাহিদাগুলো না মেটাতে পারে অভিভাবকের কাছে তাদের আর কোন দাম থাকবে না। সর্বশেষে, তারা সব সম্পর্ককে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে শেখে। শিশুদেরকে নিঃশর্ত ভালবাসা দেওয়া দরকার তারা নিজেরা যেরম সেরকমই থাকতে ভালবাসে।

কিভাবে অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রূষাকারীরা শিশুদের আবেগজনিত সুরক্ষা প্রদান করতে পারে ?

➢ <u>আবেগপূর্ণতা বা সস্নেহে রাখা</u>

স্নেহ বা ভালবাসা বেঁচে থাকার জন্য খুবই দরকারী, এটা মানুষকে এক সুরক্ষার অনুভূতি দেয়। শিশু যখন মায়ের কোলে সস্নেহে থাকে তখন সে নিজেকে খুব সুরক্ষিত মনে করে। শিশুকে মানসিক ও দৈহিক ভালবাসার অনুভূতি দেওয়াটা খুব জরুরী। একদম ছোট বাচ্চারা তার মা বাবার আলিঙ্গন পছন্দ করে । তাদের কাছে এই স্পর্শ ও দৈহিক অনুভূতিই ভালবাসার প্রকাশ।

একটু বড় শিশুদের কাছে বাবামায়ের ভালবাসার মানে হল তাকে বুঝতে পারা ও বাবামায়ের সাথে তাদের আবেগমূলক বন্ধন। সবমিলিয়ে এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে তারা সুরক্ষিত ও কর্মশক্তিপূর্ণ থাকতে পারে।

➢ <u>সহজলভ্যতার নিশ্চয়তা</u>

- শিশুর দরকারে শিক্ষক ও বাবামায়ের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় । এইরকম বিশেষ ব্যক্তির অনুপস্থিতি তাদের মধ্যে উদ্বেগের বিকাশ ঘটায়। তারা অসহায় বোধ করে।
- শিশুরা তার বাবা মা বা শুশ্রূষাকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। যদি তারা এটা সহজে পায় তবে খুব খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা সহজে সেটা না পায় তাহলে অন্যভাবে বিভিন্ন নেতিবাচক উপায়ে বাবা মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা মেজাজ দেখাতে শুরু করে, অকর্ম করে যাতে বড়রা বাধ্য হয়ে তাদের প্রতি মনযোগী হয়। তাই শিশুর প্রতি মনযোগী হওয়াটা দরকার।
- শিশু যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে বা বাড়ি ফেরে তখন উপস্থিত থাকা বা সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নেওয়া দরকার। বাবা মা দুজনেই উপস্থিত না থাকতে পারলেও অন্তত কোন একজনের থাকাটা জরুরী কারন সে মনে করে কেউ তো আছে তাকে স্বাগত জানানো বা কাছে টেনে নেওয়ার জন্য।

- যদি বাবা মা কোন কারনে না থাকতে পারে তাহলে টেলিফোনের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে সে যেন তার বাবা মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তাতে তারা সুরক্ষিত অনুভব করবে।
- কিশোর-কিশোরীরা বাড়ির বাইরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই তারা যখন বাড়িতে থাকে তখন তারা চায় বাবা মাও তাদের সাথে থাকুক।

➢ সমালোচনামূলক মন্তব্য করা উচিত না

সমালোচনামূলক কোন মন্তব্যই শিশুর বিকাশে বা তার আচরণ সংশোধনে সহায়ক না বরঞ্চ এটা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক । এইসব মন্তব্য শিশুকে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য করে এমনকি আত্মহত্যার দিকেও ঠেলে দেয়। এটা কখনই বলা ঠিক নয় যে "তোমার দ্বারা কিছু হবে না " -এই মন্তব্য তাকে কোনকিছু শিখতে সাহায্য করে না কোনভাবে, বরঞ্চ তাকে শেখানো দরকার কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি যেটা তাকে কোনকিছু শিখতে সাহায্য করবে।

➢ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখা দরকার

- শিশুদের শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে শেখাতে হবে। তারা বেশীরভাগ জিনিসই বড়দের দেখে শেখে, তাই তাদের সামনে সেরকম আচরণ করাই উচিত। তাই বাড়িতে বা স্কুলে কোন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটা শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।
- হিংসা যেকোনো ধরন বা আকারে আসতে পারে। শিশুকে মারা, তার সাথে খারাপ আচরণ করা,তাদের অবহেলা করা ও তাদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ না করা এসবই শিশুর উপর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।
- এরকম অনেক বাড়ি আছে যেখানে শিশুর যত্ন নেওয়া হয় কিন্তু বাড়ির অন্যান্য কোনো সদস্য প্রতিদিন অত্যাচারিত হয় যেমন- মা বা দাদু-ঠাকুমা। এসব থেকেই শিশুর মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব গড়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যবহার হয় শিশুর মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব গঠন করে অথবা শিশু ভয় পেয়ে একদম নিজেকে গুটিয়ে নেয়, শিশুর এই দুটি আচরণই তার সুস্থ মানসিক গঠনে বাধা দেয়।

➢ স্থিতিশীল পরিবেশ গঠন

- স্থিতিশীল পরিবেশ আমাদের সুরক্ষা প্রদান করে, ফলে আমরা কোন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি , তার ফলাফল কি হতে পারে তার একটা ধারনাও করতে পারি। অস্থিতিশীলতা আমাদের মনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কার সৃষ্টি করে। বড়দের মধ্যেও অস্থিতিশীলতা ,অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের সঞ্চার করে । এইভাবে, শিশুর কোমল মনে এই সব অস্থিতিশীলতা ,অনিশ্চয়তা আরও বেশী উদ্বেগের জন্ম দেয় ও সে এই নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না।
- শিশু তার জীবনে স্থিতিশীলতা পছন্দ করে। বাড়ি, স্কুল, শুশ্রুষাকারী ইত্যাদির বারবার পরিবর্তন তার মানসিক সুস্বাস্থ্যকে ব্যাঘাত ঘটায় ।শিশুরা বড়দের থেকে বেশী নমনীয় হয়, তারা এমনিতে নতুন পরিস্থিতিতে সহজে মানিয়ে নিতে পারে কিন্তু বারবার পরিবর্তন তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেয়, ও এগুলি শিশুর মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশাবোধের জন্ম দেয়।

- শিশুকে নানা ধরনের নিয়মানুবর্তিতা (যেমন- ঠিক সময়ে খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি করা) শেখান ভাল। তারা এরকম জীবন পছন্দ করে কারন তারা বুঝতে পারে কোনটার পর কোনটা করতে হবে। আগোছালো জীবনধারা শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ক্ষেত্রেই ভাল নয়।

কিভাবে অভিভাবক, শিক্ষক ও শুশ্রুষাকারীরা শিশুর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে ?

সমমর্মিতা বা সমানুভূতি (Empathy):

কোন ব্যক্তির সাথে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে তার প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী। শিশুরা তাদের বাবা মা, শিক্ষক, শুশ্রুষাকারীদের থেকে সমমর্মিতা আশা করে, তাই অনেকসময়ই শিশুমনকে বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু ভালভাবে দেখলে সত্যি শিশুকে বোঝা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়, তারাও বড়দের থেকে সহজভাবে চিন্তা করতে পারে। শিশু যখন পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরোয় তখন "সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ কিনা? কত নম্বর পাবে আশা করছ? , তুমি এবারেও প্রথম হতে পারবে তো ? " এসব প্রশ্ন না করে তাকে বলা দরকার " অনেক খাটুনি হয়েছে , চলো বাড়ি গিয়ে এবার বিশ্রাম নেবে"।

সক্রিয় শ্রোতা :

সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আর একটি উপায় হল শোনার ক্ষমতা। অভিভাবকতা মানেই শুধু শেখানো নয় , শিশু কি বলছে তা শোনাটাও গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে সে একসময় বাবা মাকে সবকিছু বলা বন্ধ করে দেবে ও শুধুমাত্র তার বন্ধুদের সাথেই সবকিছু বলবে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও মতামত বোঝা বা শোনা শিশুকে আপনার অনেক কাছে আনবে ও তার আবেগ বহিঃপ্রকাশেও সহায়তা করবে।
শিশুকে আপনি যত বেশী বুঝবেন বা তার কথা শুনবেন বড় হওয়ার সাথে সাথে সে ততবেশী আপনার সাথে কথা বলবে।

শিশুকে আত্মসম্মানবোধের প্রশিক্ষণ দিতে হবে:

শিশু হল ভবিষ্যতের নাগরিক। তাকে নিজের উপর বিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। আত্মসম্মান হল কোন ব্যক্তির নিজের প্রতি ইতিবাচক বিশ্বাস, এটি শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে বাড়ি ও স্কুলে সামাজিকতার মাধ্যমে। শিশুর আত্মসম্মানবোধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়-

- তার কাজের প্রশংসা করে
- তাদের পছন্দকে সম্মান জানিয়ে
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে তার অংশগ্রহনের মাধ্যমে

বয়স অনুযায়ী শিশুদের কাছে নানা চাহিদা রাখতে হবেঃ

শিশুদের কাছে তার বয়স অনুযায়ী যতটুকু আশা করা যায় ততটুকুই চাহিদা রাখা উচিত। তারা বাবা মায়ের থেকে নিঃশর্ত ভালবাসা ও সমর্থন আশা করে। বাবা-মা ই শিশুকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসে, তাকে এই

অচেনা পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। যদি বাবা মায়েরই খুব বেশি মাত্রায় চাহিদা থাকে শিশুদের কাছ থেকে তাহলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

বাবা-মায়ের ভালবাসা ও স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে শিশুকে এটাও শেখানো দরকার যে তার কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তাই সবসময় অতিরিক্ত মাত্রায় আশাবাদী হওয়া যেমন উচিত না আবার শিশুকে তার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

একজন ৭ বছর বয়সের শিশু যে সবসময় ঠিকমত লেখাপড়া করবে বা নাচ, আঁকা বা সাঁতার সবই খুব ভালভাবে করবে এটা তার কাছ থেকে আশা করলে সেটা অতিরিক্ত মাত্রায় আশা করা হবে। সেরকমই একজন ১৫ বছরের ছেলে বা মেয়ে জীবনের বড় সিদ্ধান্ত একা না নিতে পারলেও সে তার স্কুলের কাজ একাই করতে পারবে বা বন্ধুদের সাথে ভাল সম্পর্ক একাই ভালভাবে বজায় রাখতে পারবে, সেক্ষেত্রে সবসময় দরকার না হলে বাবা মায়ের কথা বলা বা থাকাটা উচিত নয়।

পরিসীমা তৈরি করাঃ

অভিভাবক ও শিশুর মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা মানেই যে শিশু যা চাইছে সবসময় তাকে সেটা করতে দিতে হবে। তার থেকে ভাল তার জন্য কিছু সীমা বা পরিসীমা বলে দেওয়া ও এটাও বুঝিয়ে দেওয়া সেগুলি অতিক্রম করলে তার ফলাফল কি হতে পারে। শিশু অনেক সময়তেই বুঝতে পারে না যে কোনটা করা উচিত আর কোনটা উচিত নয়। তাদের একটা পরিসীমার মধ্যে রেখে দিলে তারা নিয়মানুবর্তিতা ও সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ শেখার সুযোগ পাবে, এবং অভিভাবকরাও কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে শিশুদেরকে ভালভাবে পরিচালনাও করতে পারবে।

অনুসরণ করাঃ

উদাহরণস্বরূপ- রাহুলের বাবা তাকে বলেছেন যে সে যদি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় তবে তাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে কিন্তু সে খুব ভাল নম্বর পাওয়ার পরেও বাবা তাকে সাইকেল কিনে দেননি। অভিভাবকরা বেশিরভাগ সময়তেই শিশুকে পরিচালনার জন্য তাদের সামর্থ্যের বাইরে এমন কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে যেগুলি করা একদমই উচিত নয়।

উপরন্তু, শিশুদের কাছে সবসময় কোন বস্তুগত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয়, আর এমন প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে যেটা কিনা পূরণ করা সম্ভব। নাহলে শিশু আপনাকে বিশ্বাস করবে না ও এটাও শিখবে যে প্রতিশ্রুতি মানেই সেটা রাখা পূরণ করা যায় না।

কিভাবে আপনি শিশুর কাছে এক অনুকরণীয় ব্যক্তি হয়ে উঠবেন ?

অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে অভিভাবকের ভূমিকাঃ

জীবনের নানা অনিশ্চিত বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে শিশুরা কাউকে অনুসরন করতে চায়। তাদের কাছে বাবা মা বা অভিভাবকই হল প্রাথমিক অনুকরনীয় ব্যক্তি। তারা বাবা মায়ের থেকেই অনেক আচরণ শেখে। বাবা মায়েরা শিশুদের শেখায় মিথ্যে কথা বলা উচিত না কিন্তু তারা নিজেরাই অনেকসময় মিথ্যে কথা বলে ও শিশুরা সেটা বুঝতেও পারে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে সত্যের পথে চলার থেকে নিজের মত রাস্তা বেছে নেয় অনেকসময় । অভিভাবকরাই অনেকসময় শিশুদের শেখায় অন্য শিশুদের সাথে না মিশতে বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ঝগড়া করতে, আবার একই সময়ে শিশুর কাছ থেকে ভাল ব্যবহার, সামাজিকতা, অহিংসা আশা করে যেটা শিশুমনে নানা দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটায়। তাই শিশুর সাথে সেরকম আচরণই করতে হবে যেটা শিশুর থেকে আশা করা হয়।

পরামর্শদাতা খুঁজে নিতে সাহায্য করতে হবে:

শিশু যখন বড় হয় তখন সে বিভিন্ন কারনে সবসময় সবকিছু বাবা মায়ের সাথে ভাগ করে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এই সময় যদি তারা কোন পরামর্শদাতা খুঁজে নিতে পারে যে তাকে অনেক ব্যাপারে সাহায্য করবে, পরামর্শ দেবে তাহলে সেটা তার কাছে অনেক সুবিধাজনক। ভাই, দাদা, কাকু, কাকিমা বা অন্যান্য পরিবারের সদস্য অথবা পরিবারের বাইরের কেউ যেমন- শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব যেকেউ এই পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রাণবন্ত শিশু কারা?

যে সমস্ত শিশুরা অপ্রতিরোধ্য মানসিক চাপকে প্রতিহত করতে পারে এবং সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে তারাই হল প্রানবন্ত শিশু।

টেবিল- ৫ **প্রানবন্ত শিশু ও কৈশোরপ্রাপ্ত শিশুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য**

উৎস	বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি নিজেই	• উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন • আকর্ষণীয়, সামাজিক, সুস্বভাব • স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্মবিশ্বাস , উচ্চতর আত্মসম্মানবোধ • প্রতিভা • বিশ্বাস
পরিবার	• কোন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক • কর্তৃত্বপূর্ণ অভিভাবকতা, স্নেহ, সংগঠিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা • আর্থসামাজিক সুবিধা

	• সমর্থনকারী পরিবারবর্গের সাথে সম্পর্ক
পরিবার বর্হিভূত প্রসঙ্গ	• পরিবার বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক • বিভিন্ন সমাজ সাংগঠনিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক • কার্যোপযোগী স্কুলে মনোনিবেশ

Source: Masten and Catsworth, 1998

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিভাবক বা শুশ্রূষাকারীরা শিশুকে সবসময় ভাল সুরক্ষার যেরাটোপে রাখতে পারে না, যেখানে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ও শিশু ভাল থাকতে পারবে। কিন্তু শিশুকে সেরকম পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যেখানে সে প্রানবন্ত শিশু হয়ে উঠবে ও নানা পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

অভিভাবকদের বা শুশ্রূষাকারীদের কি কি করা উচিত ও কি কি করা উচিত নাঃ

কি কি করা উচিতঃ

- শিশুকে ভালবাসুন, তাকে দেখান যে তাকে পেয়ে আপনি কত গর্বিত, তার চেষ্টা বা কোন ভাল কাজকে সবসময় প্রশংসা করুন *এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।*

- শিশুর জন্য রোজকার একটা রুটিন তৈরি করে দিলে ভাল যেমন- কখন খাবার সময়, কখন পড়াশোনা করবে, কখন স্নান করবে (এটা লক্ষ্য রাখুন সে সত্যি স্নান করছে কিনা বা কিভাবে সাবান মেখে পরিষ্কারভাবে স্নান করা দরকার) , এবং সে কোন সময়ে ঘুমাবে। ছুটির দিনে কিছু সময়ের হেরফের হলেও অন্যদিনগুলি সে যেন সময় মত সবকিছু করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

- শিশুর বিভিন্ন কাজকর্মে সেটা বাড়ি বা স্কুলে হোক তাতে আপনার ইচ্ছার প্রকাশ পাওয়াটা দরকার।

- প্রতিদিন তাদের ব্যাগ, বই খাতা দেখা বা সই করা দরকার। এর থেকে স্কুলের ধারনা হয় এই বাবামেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি যত্নবান নয় , তারা অলস বা ভুলে যায়। অনেক শিশু স্কুলের অনেক কাজে অংশগ্রহন করতে পারে না কারন তার বাবা মায়েরা রোজ ঠিকমত বই খাতা দেখে না।

- পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত বিষয় গুলিতেও শিশুকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া দরকার।

- শিশুকে সাহায্য করতে হবে ও শেখাতে হবে কিভাবে পেনসিল ধরতে হয়, নাম লিখতে হয়, অঙ্ক করতে হয়, বানান ও বিভিন্ন খেলাধুলা শেখাতে হবে।

কি কি করা উচিত নয়ঃ

- শিশুর শোয়ার ঘরে টিভি, ভিডিও গেম ইত্যাদি রাখতে দেবেন না। অন্য সময়ে বড়দের সামনে এগুলি ব্যবহার করাই ভাল, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দিলেও ভাল।
- শিশুকে খুব হিংসাত্মক ভিডিও গেম বা কোন হিংসাত্মক ঘটনা টিভিতে না দেখতে দেওয়া ভাল, এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়া টাও সবসময় ঠিক নয়
- অভিভাবকদের সবসময় জানতে হবে তার শিশু কোথায় আছে ও কি করছে। তাদের একা ছেড়ে না দিয়ে চোখে চোখে রাখা ভাল। যদি তারা স্কুলে যায় তাহলে প্রতিদিন তাদের বই খাতা দেখলে একটা ধারনা পাওয়া যায়।
- শিশুকে একা রেখে ছুটির দিনে বাইরে ঘুরতে যাওয়া উচিত না, তারা সবসময় কারুর তত্ত্বাবধানে থাকতে চায়।
- শিশুর সামনে ধূমপান করা উচিত নয় , এটা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- স্কুলের পণ্ডির মধ্যে মোবাইলে কথা বলা উচিত না। বরঞ্চ শিশুকে স্কুলে পৌছে দেওয়ার সময় তার সাথে হেসে বলা যে আপনি ওকে কত ভালবাসেন, স্কুলে ভালভাবে থাকতে বলা এগুলি করলে শিশু খুশি হবে
- যদি শিশু গাড়িতে যায় তাহলে শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত কোন গান বাজানো উচিত না।

৩. নিজেকে জানো

এই অধ্যায়ে আমরা জানবো.....

কিভাবে আমরা নিজেরা নিজেদের মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও রাগ পরিচালনা করবো এবং সেই পদ্ধতিগুলি শিশুদের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে।

নিজেকে জানা এতটা জরুরী কেন?

যখন ইতিবাচক অভিভাবকতা ও শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার কথা বলা হচ্ছে সেখানে নিজের ব্যাপারে জানাটাও এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিভাবকের মধ্যে অভিভাবকতার অভাব থাকে না কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তারা সঠিক উপায়ে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারে না তাদের আবেগজনিত উদ্বেগের কারনে। তাই তারা শিশুকে নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর এমন রাস্তা বেছে নেয় যাতে ফল সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারে আর সেটা হল শিশুকে বকা ও মারা। কিন্তু এগুলোই শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে। যদি আমরা অভিভাবকদের এইসব হতাশা বা মানসিক চাপের কারণগুলি বুঝতে চেষ্টা করি যে কারনে তারা তাদের শিশুর সাথে খারাপ ব্যবহার করতেও উদ্যত হয় ও অজান্তেই শিশুর ক্ষতি করে, তাহলেই আমরা অভিভাবক ও শিশুর মধ্যে সুস্বাস্থ্যকর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গোড়ে তুলতে পারব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কারনগুলি হতে পারে:

- মানসিক চাপ
- আবেগজনিত পীড়া
- রাগ সামলানোতে অক্ষমতা
- অভিভাবকদের ভয় ও উদ্বেগ

শিশুকে কার্যকারীভাবে পরিচালনার জন্য বাবা মাকে ও শুশ্রুষাকারীদের আগে নিজেদেরকেই ভালভাবে জানতে হবে। তাই এখানে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিভিন্ন পরস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার কিছু পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

মানসিক চাপ (Stress) বলতে কি বোঝায় ?

আমরা সাধারণত মানসিক চাপ বা stress কথাটা ব্যবহার করি যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় চাপ আসে। আমরা অতিমাত্রায় চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পরি ও আশ্চর্য হই আদতেও এই সমস্ত মানসিক চাপের মোকাবিলা করতে পারব বা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব কিনা।

এইসব মানসিক চাপের উৎস বা সূত্র কি কি?

- প্রতিদিনের ঝামেলা বা অশান্তি
- সঙ্গীসাথীর সাথে দ্বন্দ্ব
- কাজের জায়গায় সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব
- বাড়ির যেকোনো সদস্যের সাথে দ্বন্দ্ব
- নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য
- অর্থনৈতিক সঙ্কট
- জীবনের ঘটনা (কারুর মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ , বেকারত্ব, বিবাহ)
- অতিরিক্ত কাজের বোঝা

কিভাবে একজন ব্যক্তি তার মানসিক চাপের কার্যক্ষমতাকে পরিচালনা করবে ?

- **উৎস বা সূত্র খুঁজে বের করঃ** বিভিন্ন মানসিক চাপের সাথে মোকাবিলা করার জন্য তার সঠিক সূত্র খুঁজে বার করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, গতকাল দীপার মেয়ে পুতুল কিনে দিতে বলায় সে মেয়েকে মারল, পরে সে বুঝতে পারল যেহেতু সে একটা মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাই সে এরকম ব্যবহার করল, যেটা মা ও শিশুর সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।
- **মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার:** পরবর্তী পদক্ষেপ হল সেই পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া যায়। যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে তার সমাধানও আছে। মাঝে মাঝেই আমরা অতিরিক্ত মানসিক চাপগ্রস্থ হয়ে বিচার বিবেচনা করার ও-সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি ফলত আরও সমস্যাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়!
- **ইতিবাচক স্ব-বিবৃতির (Self-statement) ব্যবহার:** সবসময় ইতিবাচক স্ব-বিবৃতি ব্যবহার করা উচিত, যেমন -"আমি পারবো" , " আমি নিজেই এই পরিস্থিতি সামলাতে পারবো ", " খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলব "। তাহলে আপনার শিশুও এগুলির ব্যবহার শিখবে। যেমন- দত্তবাবু যখনি তার অফিস বা বাড়িতে কোন অসুবিধাজনক বা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন তিনি নেতিবাচক দিক দিয়ে বিষয়গুলি দেখে ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। আবার গতকাল দত্তবাবুর ছেলে রোহানও এক সমস্যায় পরেছিল। স্কুলের হেড মাস্টারমশাই তার ব্যাপারে নালিশ জানিয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে কারন শোনা গেছে সে নাকি স্কুলে উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, কিন্তু আসলে সে এটা করেনি। প্রথমে সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল তারপর ভাবল " আমি এই পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবো "। সে এটা তার বাবা মায়ের কাছে শিখেছে এবং সে এটা প্রমান করে দিল।
- **মানসিক চাপকে চ্যালেঞ্জ জানানো:** মানসিক চাপকে শত্রু হিসাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। যে ব্যক্তি যতবেশী মানসিক চাপগ্রস্থ হবে তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ততবেশী প্রভাবিত হবে। যেমন- রিনা সসময়ই কোন মানসিক চাপে ভোগে তাই সে যেকোনো কারন ছাড়াই বিরক্ত হয়ে যায় ও তার ছেলেকে বকে, মারে অথবা স্বামীর সাথে ঝগড়াঝাটি করে। এইভাবে তার ছেলে ও স্বামীর সাথে সম্পর্ক প্রভাবান্বিত হচ্ছে ।
- **লেখা:** কোন মানসিক চাপজনিত ঘটনা লিখে ফেললে অনেকটা চাপমুক্ত মনে হয় এবং মানসিক চাপের কারন ও তার সঠিক সমাধানের পথও খুঁজে নেওয়া যায়।
- **দাবিপূর্ণতা গঠনের দক্ষতা:** বেশিরভাগ সময়েই মানুষ মানসিক চাপে ভোগে কারন তারা নিজেদের দাবি, মতামত, তাদের অনুভূতি, আবেগ প্রকাশ করতে পারে না।

- বন্ধুত্বপূর্ণতাঃ বিভিন্ন অসুবিধা, মানসিক চাপের কথা বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে অনেক সময় চাপমুক্ত হওয়া যায়। যেমন- শিশুদের কাছে নিজের কষ্ট বা দুঃখের কথা আলোচনা করলে সেটা অনেক সময় শিশুর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।
- ব্যায়াম বা শরীরচর্চা: ব্যায়াম বা শরীরচর্চা একটি ভাল অভ্যাস কারন এটি আমাদের শরীরের মাংসপেশিকে শিথিল করে ও বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে যেটা আমাদের শরীর ভাল রাখার পক্ষে উপযোগী।
- খাদ্যঃ বিভিন্ন মানসিক চাপের মধ্যে অনেক সময় আমরা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিই, কিন্তু খাবার থেকে আমরা গ্লুকোজ পাই যেটা আমাদের সেই পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা করতে শক্তি যোগায়।
- সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্ভুক্তিঃ

  - গভীর নিঃশ্বাস
  - শান্তভাবে দেখা
  - হাসি
  - অঙ্গমর্দন করা
  - স্নান
  - মনোযোগকরনের অভ্যাস

উদ্বেগ কাকে বলে?

উদ্বেগ হল স্নায়বিক দুর্বলতা, ভয়, আশঙ্কা, চিন্তার অনুভূতি। এটি আমাদের অনুভূতি ও আচরণকে প্রভাবিত করে ও এর কিছু দৈহিক প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। উদ্বেগ অনেকটা ভয়ের মতই অনুভূতি কিন্তু কোন জিনিশকে আমরা ভয় পাই সেটা আমরা জানি কিন্তু প্রায়শই আমরা বুঝতে পারি না উদ্বেগের কারন কি।

কিভাবে একজন তার ভয় ও উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করবে ?

উৎস খুঁজে বার করাঃ

ভয় ও উদ্বেগের সাথে মোকাবিলা করার জন্য তার উৎস খুঁজে বার করা, ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাটা দরকার।যদি ভয় অবাস্তব বা কাল্পনিক হয় তাহলে সেটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যাতে এটা কোনভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত না করতে পারে।

মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাঃ

ভয় ও উদ্বেগের ধরণের উপর ভিত্তি করে সেগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ - যদি একজন মা তার ছেলে বা মেয়ের স্কুলে ভাল নম্বর না পাওয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার উদ্বেগের কারন জানার সাথে সাথে এটাও ভাবতে হবে শিশুটিকে না মেরে ভালভাবে পড়াশোনা করে ভাল নম্বর পেতে কিভাবে তার ছেলে বা মেয়েকে সাহায্য করা যায়।

চিত্তবিনোদন বা শিথিলকরন (Relaxation):

চিত্তবিনোদন বা মনযোগী হওয়া উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। যোগাসন, ধ্যান, ব্যায়াম ইত্যাদি উদ্বেগ নিয়ন্ত্রনের বিভিন্ন উপায়।

উদ্বেগ বা চিন্তনের তালিকা (Worry tree):

যদি কোন ব্যক্তি তার উদ্বেগ নিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তিত হয় তাহলে সে এই নিম্নোক্ত তালিকার সাহায্য নিতে পারে।

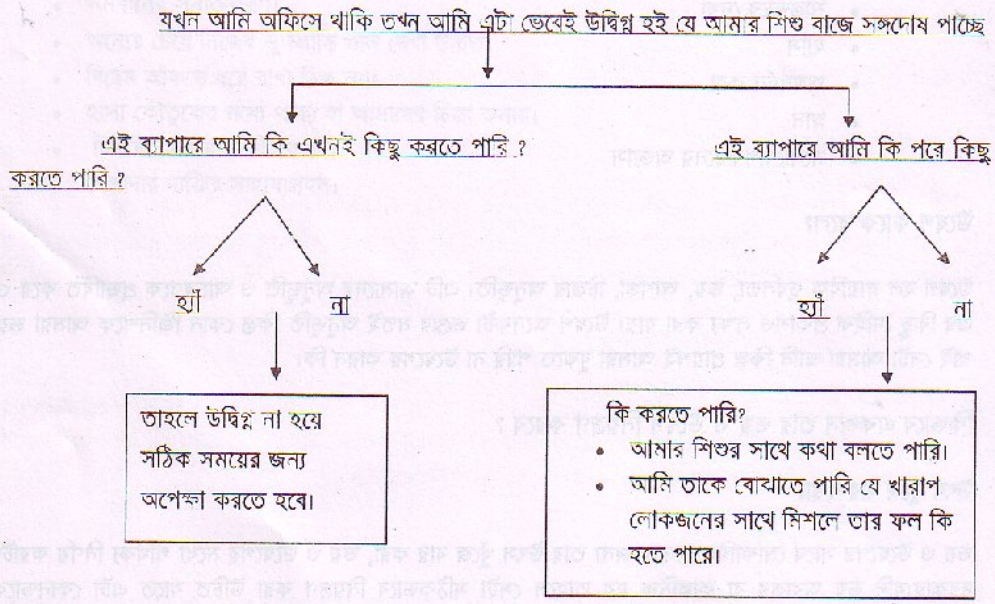

চিন্তনের সময়:

একজন উদ্বেগকারী ব্যক্তি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে যা তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে ফলে সে দিন দিন আরও বেশীমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পরে। তাই তাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয় যে সবসময় চিন্তিত না হয়ে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করতে যাতে বাকি সময় গুলো সে চিন্তামুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। এরফলে সে দুভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রথমত, সে দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোতে মনযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়ত, আর চিন্তনের সময়ে সে আরও ভালভাবে যুক্তিসম্মতভাবে সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে পারবে।

মানসিক বিস্ফোরণ (Emotional Outburst)কাকে বলে?

হটাৎকরে ও প্রচণ্ড উদ্দামতার সাথে কোন আবেগের বহিঃপ্রকাশকে মানসিক বিস্ফোরণ বলা হয়। এটা প্রচণ্ড রাগ, কান্না বা হাসিরও বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

রাগ (Anger) কাকে বলে?

রাগ হল পুরোপুরি স্বাভাবিক, সাধারণত স্বাস্থ্যকর, মানসিক আবেগ। কিন্তু যখন এটা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় তখন এটা একটা ধ্বংসাত্মক বা সর্বনাশক আবেগে রূপান্তরিত হয়। তখন এটা কাজের জায়গা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সমস্ত জীবনযাত্রাকেই প্রভাবিত করে।

কিভাবে মানসিক বিস্ফোরণ ও রাগ নিয়ন্ত্রন বা পরিচালনা করা যায় ?

- **ঘটনার অর্থপূর্ণতা:**

যে ঘটনা আপনাকে বিরক্ত করছে সেটার অন্তর্নিহিত অর্থ জানাটা সাহায্যকারী ব্যাপার। কিভাবে আপনি ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছেন , এর পেছনে রাগের কারন কি , ঠিক কি ধরণের চিন্তাভাবনা আপনার মনে আসছে, ঠিক কিরকম অনুভূতি হচ্ছে আপনার (লজ্জাজনক,খেলো বা নিচ মনে হচ্ছে, রাগ,দুঃখ, হতাশা)।

- **আপনার ক্ষমতা ও সামর্থ্যগুলির সনাক্তকরণ:**

আপনার দুর্বলতাগুলোতে জোর না দিয়ে আপনার ক্ষমতা বা সামর্থ্যগুলো সনাক্ত করা উচিত, তাহলে এটা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ও আপনার আবেগ ভালভাবে নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করবে। এইভাবে একজন নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ও তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

- **সঠিক আবেগের প্রদর্শন:**

পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনটা সঠিক ও কোনটা বেঠিক আবেগ সেগুলি সনাক্ত করতে হবে। যে আবেগের অভিজ্ঞতা আছে ও যে আবেগ প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

- **হটাৎ আগত আবেগের বিলম্বিতকরণ:**

কোন হটাৎ করে উত্তুত আবেগ প্রকাশ না করা বা দেরি করে প্রকাশ করাই ভাল। এটা দেখা গেছে আবেগ ধীরে ধীরে সময়ের সাথে প্রশমিত হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যখন মানসিকভাবে স্থিতিশীল থাকে বেশি ভালভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- মিত্রবাবু একজন অধ্যাপক। আগামীকাল কলেজ যাওয়ার আগে তার ভাড়াটেদের সাথে ঝগড়া হয়, তারপর কলেজ যাওয়ার পথে তিনি ভাবছিলেন যে আজ ক্লাস নিতে পারবেন কিনা, তারপর তিনি দেখলেন আস্তে আস্তে তার রাগটা কমে গেছে ও তিনি ভালভাবেই ক্লাস নিতে পেরেছেন।

➢ **মানসিক সমর্থনের চাহিদাঃ**

বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের থেকে মানসিক সমর্থন পাওয়া খুবই উপকারী। আপনার অনুভূতিগুলো সম্বন্ধে তাদের বলুন ও এটাও বলুন সেইসব পরিস্থিতিতে আপনার পাশে তাদের থাকাটা একান্ত কাম্য।

➢ **রাগ নিয়ন্ত্রনের নয়রকম পদ্ধতিঃ**

- যখন আপনি শান্ত বা স্থিতিশীল তখন প্রকাশ করুন।
- বলার আগে ভাবুন।
- সমধানের সনাক্তকরণ।
- অন্যের চেয়ে নিজের ভুলভ্রান্তি গুলি দেখা উচিত।
- বিদ্বেষ আঁকড়ে ধরে রাখা ঠিক নয়।
- হাস্য কৌতুকের মধ্যে থাকা যা আমাদের চিন্তা কমায়।
- চিত্তবিনোদন বা শিথিলকরন।
- পেশাদার ব্যক্তির সাহায্যগ্রহন।

৪। শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাঃ

এই অধ্যায়ে আমরা জানবো

- শিশুর সমস্যাযুক্ত আচরণের সনাক্তকরণ
- শিশুর বিভিন্ন সমস্যাগুলির গভীরতা উপলব্ধি, সমস্যাগুলির কারন, শুশ্রুষাকারীরা, অভিভাবক ও শিক্ষকরা সেই পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত করবেন।

শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে?

নিয়মানুবর্তিতার একটি নেতিবাচক অর্থও আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিয়মানুবর্তিতা বলতে বোঝায় ঃ

- শিশুর জন্য পরিষ্কার কিছু নিয়ম ঠিক করা।
- শিশু কি করতে পারবে জন্য পরিসীমা গঠন করা ও তার বাইরে গেলে তার ফলাফল কি হবে তা বুঝিয়ে দেওয়া।
- সামঞ্জস্য।

শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা হলঃ

- শিশুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মেলামেশা
- বিকল্প ইতিবাচক আচরণ করতে শিশুকে উৎসাহী করা।
- শিশুর সমস্যাগুলিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা।
- গঠনমূলক পরিবর্তন আনা।
- কিছু উদাহরণ নির্ধারণ

শান্তিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার ধরন বা রুপ কি কি ?

জ্ঞানমূলক ও আচরণমূলক নীতির উপর ভিত্তি করে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যাগুলি পরিচালনা করার কিছু বিজ্ঞানসম্মত উপায় আছে. যদিও নিয়মানুবর্তিতার কিছু প্রাথমিক নীতি আছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিশুর সমস্যা আলাদা আলাদা ও তাদের পরিচালনা করার ধরনও আলাদা হওয়া উচিত। কোন একটি পদ্ধতি একটি শিশুর সমস্যা মেটাতে কার্যকারী কিন্তু আবার অন্য আরেকজনের ক্ষেত্রে কার্যকারী নাও হতে পারে। তাই পদ্ধতিগুলি ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করতে হবে ও তাই শিশুদের এই সমস্যাগুলি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সৃষ্টিশীল বা সৃজনক্ষম (innovative) হতে হবে।

কিভাবে আমরা সমস্যাযুক্ত আচরণগুলিকে বিভক্ত করবো ?

বাল্যকালের সমস্যাগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- অন্তর্মুখী সমস্যা (Problem of Internalization): যখন শিশু সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ও কারুর সাথে মিশতে চায় না। যেমন- খেতে চায় না, কথা বলতে চায় না, স্কুলে যেতে চায় না ও বাড়ির কোন কাজকর্ম ও করতে চায় না।
- বহির্মুখী সমস্যা (Problem of Externalization): যখন শিশু প্রচণ্ড অস্থির, দুষ্টু, ভবঘুরে হয়, মিথ্যে কথা বলে, চুরি করে ও তাকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যেমন- দৌড়াদৌড়ি করা, প্রচণ্ড পরিমানে কথা বলা, জিনিষপত্র ছুরে ফেলে দেওয়া।

যাদের বহিরাগত সমস্যা দেখা যায় তাদের সমস্যাটা বেশি হয় ও অন্যদের জন্যও সেটা অসুবিধাজনক। কিন্তু যেসব শিশুদের অন্তর্মুখী সমস্যা আছে তাদেরও যত্ন সহকারে দেখা উচিত। দুক্ষেত্রেই শুশ্রুষাকারী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা চাইলে কোন বিশেষজ্ঞেরও সাহায্য নিতে পারেন।

ইতিবাচক আচরণ করার জন্য কিভাবে শিশুকে অনুপ্রাণিত করা যায় ?

শিশুকে ভাল বা ইতিবাচক আচরণ করানোর বিভিন্ন উপায় আছে যেগুলি তার জন্য উপযোগী। এখানে শিশুর মধ্যে নতুন নতুন ইতিবাচক আচরণ গঠনের কতগুলি উপায় আলোচনা করা হলঃ

ইতিবাচক বলবৃদ্ধি (Positive Reinforcement) : যখন শিশু কোন ইতিবাচক আচরণ করে তখন তার সেই আচরণ বাড়ানোর জন্য শিশুকে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার কোন খেলার জিনিষ, লজেন্স, আবার কোন কাজের প্রশংসা, শিশুকে তার প্রিয় টিভির অনুষ্ঠান দেখতে দেওয়া বা নিজের পছন্দ মত খেলতে দেওয়া ইত্যাদি হতে পারে।

বলবৃদ্ধির সময়সূচী (Schedule of Reinforcement): বলবৃদ্ধির সময়সূচী অনেক আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখতে হবে। পুরস্কারের মূল্য কমে যাবে যদি সেটা বার বার ব্যবহার করা হয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বলবৃদ্ধির প্রয়োগ করা উচিত।

উদাহরণঃ অর্জুন বেশিরভাগ দিনই সকালে ঠিক সময় ঘুম থেকে ওঠে না ফলে স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যায়। বাবা মা এই ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক বলবৃদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। যেমন -সে যেদিন ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠবে চকলেট পাবে বা মা তাকে আদর করবে। তার সাথে এটাও দেখা দরকার সে রাতে ঠিকমত ঘুমাচ্ছে কিনা।

টোকেন ইকোনমি (Token Economy): ইতিবাচক বলবৃদ্ধি প্রয়োগ করে আচরণ পরিবর্তনের পদ্ধতি হল টোকেন ইকোনমি । এই বলবৃদ্ধি হল এমন কিছুর নিদর্শন বা আচরণ পরিবর্তনে সহায়ক। যেমন- হাসি, চকোলেট ইত্যাদি।

উদাহরণঃ প্রিতমের মধ্যে তিন ধরণের সমস্যামূলক আচরণ দেখা গেছে। সে স্কুলে যেতে চায় না, স্কুলে গিয়ে এক জায়গায় বসে থাকে ,কারুর কোন কথার উত্তর দেয় না, টিফিনের সময় টিফিন খায় না। বলবৃদ্ধি দিয়ে তার এই আচরণগুলি পরিবর্তন করার জন্য তাকে উৎসাহিত করা দরকার। ঠিক করা হল যে প্রিতম স্কুলে যাওয়ার জন্য,

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, টিফিন খাওয়ার জন্য তিন পয়েন্ট পাবে। সে এই পয়েন্টগুলো জমিয়ে তার বদলে তার পছন্দের কিছু জিনিস বা পছন্দের কাজ সে করতে পারবে। যেমন-

১০ পয়েন্ট = একটি চকোলেট

১৫ পয়েন্ট =কালার পেন্সিল

২০ পয়েন্ট = বাবার সাথে বাইক চড়তে পারবে

সে ঠিকমত কাজ না করলে বাবা মা তার থেকে পয়েন্ট কেটেও নিতে পারে ।

নোটঃ বাবা মায়ের ও শুশ্রুষাকারীদের শিশুর এই সমস্যামূলক আচরণের কারণগুলিও খুঁজে বের করা দরকার।

আচরণ গঠন (Shaping behaviour): আচরণ গঠন হল ইতিবাচক বলবৃদ্ধির মাধ্যমে কাম্য আচরণের দিকে এগোনোর প্রক্রিয়া। এখানে ব্যক্তি যত তার লক্ষ্যের দিকে পৌঁছায় তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

উদাহরনঃ পিয়া ৫ বছরের মেয়ে, বাড়িতে কোন লোক এলে কথা বলে না, সবসময় মায়ের কোলে বা ঘোরের মধ্যে থাকতে চায়। তাকে কথা বলানোর জন্য কিছু ধাপে এগোতে হবে ঃ

- মায়ের সাথে অতিথিদের কাছে আনতে হবে।
- যেখানে অতিথিরা বসে থাকবে সেখানে তাকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে।
- যেখানে অতিথিরা বসে আছে তাদের পাশে বসাতে হবে।
- অতিথিরা যা প্রশ্ন করবে উত্তর দেওয়া।
- আস্তে আস্তে অল্প কথাবার্তা বলতে শুরু করা।
- তারপর নিজে থেকেই অতিথিদের সাথে কথা বলবে।

এই প্রত্যেকটি ধাপে সে লক্ষ্য আচরণের দিকে এগিয়ে যাবে। এরজন্য তার প্রত্যেকটি আচরণকে উৎসাহিত করতে হবে।

নোটঃ বাবা মাকে অতিথিদের বলে রাখতে হবে যাতে তারা পিয়াকে কথা বলতে জোর না করে।

কিভাবে মাত্রাধিক আচরণকে কমানো যায় ?

মাত্রাধিক আচরণ হল সেইসব আচরণ যে নেতিবাচক বা সমস্যাজনক আচরণগুলি শিশুর মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা যায়। যেমন- অতিরিক্ত মাত্রায় কথা বলা বা চুরি করা এই আচরণের উদাহরণ।

- অন্যান্য আচরণের পার্থক্যমূলক বলবৃদ্ধি (Differential Reinforcement of Other Behaviour): ইতিবাচক বলবৃদ্ধি দেওয়া হয় যখন সে খারাপ আচরণের বদলে অন্যরকম কোন আচরণ করে।
  উদাহরনঃ একজন শিশুর নখ কাটা বা নাকে হাত দেওয়ার খারাপ অভ্যাস আছে। সে যদি এগুলি ছাড়া অন্য কোন হাতের কাজ করে তাহলে তাকে বলবৃদ্ধি দেওয়া হবে।

- অসঙ্গত আচরণের পার্থক্যমূলক বলবৃদ্ধি (Differential Reinforcement of Incompatible Behaviour) : শিশুর অসঙ্গত আচরণকে শাস্তি দিয়ে না কমিয়ে সে অন্য কোন আচরণ করলে তাতে বলবৃদ্ধি প্রয়োগ করলে সে হয়ত ঐ অসঙ্গত আচরণ কমাবে।
  উদাহরনঃ একজন ১৫ বছরের ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পর ২ ঘণ্টা টিভি দেখে। তাকে টিভি দেখার জন্য শাস্তি দেওয়া হয় না কিন্তু সেইসময় অন্য কোন আচরণ করলে, যেমন - ফুটবল খেলতে গেলে তাকে পুরষ্কার বা বলবৃদ্ধি দেওয়া হয়।
- প্রিমার্ক প্রিন্সিপাল: এটি একটি বিশেষ ধরণের পদ্ধতি। এখানে শিশুর পছন্দের আচরণটাকেই বলবৃদ্ধি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

  উদাহরনঃ তুতান একটি ৩ বছরের শিশু, সে কিছুমাস ধরে স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু শিক্ষকরা তাকে সামলাতে পারে না কারন সে সারাক্ষন দৌড়ে বেড়ায়, এখানে প্রধান লক্ষ্য হল তুতানকে এক জায়গায় বসানো। এখানে তুতান বসার থেকে দৌড়াতেই বেশি ভালবাসে। তাই এই নীতি অনুযায়ী তাকে ১৫ মিনিট বসার জন্য ৫ মিনিট দৌড়াতে দিতে হবে, পরে তার আচরণ দেখে সময়ের পরিবর্তন করতে হবে।

- আচরণগত চুক্তি (Behavioural Contracts):

আচরণগত চুক্তি হল একজন ছাত্র বা শিশুর সাথে তার শুশ্রুষাকারী, শিক্ষক বা বাবা মায়ের চুক্তি। এই চুক্তিতে বলা থাকে যে কোন আচরণগুলি কাম্য, কোনগুলো কাম্য নয়, শিশুর কোন ভাল আচরণ গঠনে তার কি লাভ হবে বা আচরণ গঠনে অসফল হলে তার কি ফলাফল হবে।

উদাহরণ- একটি ১৪ বছরের মেয়ে, রোজ মা তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। মাকে অনেকবার অনুরোধ করায় মা তাকে স্কুল বাসে করে ফেরার অনুমতি দিল। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল সে স্কুল থেকে দেরী করে ফিরছে ও খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে স্কুল বাসে না ফিরে তার এক বন্ধুর সাথে ফেরে। তখন তার বাবা মা তার সাথে এক আচরণগত চুক্তি করতে পারেঃ

আকাঙ্ক্ষিত আচরণঃ ঠিক সময়ে স্কুল বাসে করে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে হবে

অনাকাঙ্খিত আচরণঃ দেরী করে বন্ধুর সাথে বাড়ি ফেরা।

আকাঙ্ক্ষিত আচরণ করার সুবিধাঃ বাবা মায়ের প্রশংসা, প্রিয় খাবার, একা বাড়ি ফেরার স্বাধীনতা পাবে।

অনাকাঙ্খিত আচরণ করার ফলাফল: স্বাধীনতা হারাবে, আবার মায়ের সাথেই রোজ স্কুল থেকে ফিরতে হবে।

উদাহরনঃ একজন ৮ বছরের শিশুর প্রবনতা ছিল তার সহপাঠীদের থেকে পেনসিল নিয়ে নেওয়া। বাবা মা তাকে অনেকবার বুঝিয়েছে যে এটা ঠিক কাজ নয়, কিন্তু তাও সে সেটা করতে বিরত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাবা মা তার সাথে আচরণগত চুক্তি করতে পারে।

আকাঙ্ক্ষিত আচরণঃ সহপাঠীদের থেকে পেনসিল না নেওয়া।

অনাকাঙ্খিত আচরণঃ সহপাঠীদের থেকে পেনসিল নেওয়া।

আকাঙ্ক্ষিত আচরণ করার সুবিধাঃ বাবা মায়ের বা শুশ্রুষাকারীর প্রশংসা, যদি সে পরপর ১০ দিন ধরে কারুর থেকে পেনসিল না নেয় তাহলে সে বাবা মায়ের থেকে একটা ভাল পেনসিল পাবে।

অনাকাঙ্খিত আচরণ করার ফলাফলঃ বাবা মা শুশ্রুষাকারীর ও শিক্ষকের অসন্তর্থন, সহপাঠীদের পেনসিলগুলি ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি তার নিজের পছন্দের পেনসিলটিও দিয়ে দিতে হবে।

- **প্রতিক্রিয়ার মূল্য (Response Cost):** এটি আচরণ পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি। এখানে শিশুকে তার একটি আচরণ সংশোধন করতে হয় অন্য আরেকটি আচরনের মাধ্যমে।

উদাহরনঃ একটি ১০ বছরের ছেলে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দেয় যখন তার চাহিদা পূরণ করা হয় না।

কি করা উচিত না:

- চাহিদা পূরণ না হওয়ায় যখন সে জিনিসপত্র ফেলছে তখন তার চাহিদা না পূরণ করাই উচিত।
- দামী জিনিসপত্র তার নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- যেটা সে ভেঙে দিয়েছে তাকে আবার সেটা সঙ্গে সঙ্গে না কিনে দেওয়া উচিত না।

কি করা উচিতঃ

- তাকে ভাঙা জিনিসগুলোর দাম কত হয় তা হিসেব করতে বলা
- তাকে বলতে হবে ঐ জিনিসগুলোর ক্ষতিপূরণ দিতে (যদিও এটা জানা কথা যে সে কখনই ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না , কিন্তু তাকে বলতে হবে যাতে তার মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ আসে ।
- তাকে বলতে হবে ভাঙা জিনিসগুলো ঠিক সারিয়ে দিতে (সে যতটা পারে তাকে করতে দিতে হবে, তাকে বুঝতে দিতে হবে সে এই কাজটা করতে পারবে না ।
- তাকে সারাই করার দোকানে নিয়ে গিয়ে তাকেও সারাইয়ের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে (যাতে সে বুঝতে পারে টাকাটাই বড় কথা না, সময় বা খাটুনিরও মূল্য আছে।

নোট - এই পদ্ধতি প্রয়োগের সাথে সাথে বাবা মায়ের বা শুশ্রুষাকারীর উচিত তার সাথে বসে তাকে রাগ নিয়ন্ত্রণ বা কমানোর অন্য উপায় গুলি শেখাতে হবে হবে।

- **টাইম আউট (Time Out) :**

এই পদ্ধতিতে শিশুকে শান্ত করানো হয়, নতুন কিছু শেখানো যায় ও অসঙ্গত আচরণ বন্ধ করাও যায়। অসঙ্গত আচরণ বন্ধ করার জন্য তার পছন্দের কিছু জিনিস তাকে করতে দেওয়া হয় না বা সেই জায়গা থেকে তাকে কিছুক্ষন সরিয়ে আনা হয়।

উদাহরন ১: একটি শিশুকে একটানা আধ ঘণ্টার জন্য টিভি দেখতে দেওয়া হয়। আধ ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পর তাকে টিভি বন্ধ করে দিতে বলা হয়, কিন্তু তাকে অনেকবার বলা সত্ত্বেও যদি সে আরও ১০ মিনিট ধরে টিভি দেখতে থাকে তাহলে তার বাবা মা বা শুশ্রুষাকারীর টিভি বন্ধ করে দিতে পারে বা লাইন কেটে দিতে পারে।

উদাহরণ ২: একটি শিশু ভিড়ের মধ্যে কাঁদতে শুরু করল ও তাকে কোনভাবে সেখানে থামানো গেল না। তখন তাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হল ও তারপর সে চুপ করল।

- লিমিট সেটিং (Limit Setting) এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্য কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ সময়েই শিশুরা বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয়। অভিভাবকরা তাকে বলে দেয় তুমি টিভি দেখবে না, খেলবে না, সোফায় লাফাবে না কিন্তু তাকে এটাও বোঝাতে হবে যে এগুলি না করে সে অন্য আর কি কি করতে পারে।

উদাহরনঃ আরিয়ান ৬ বছরের ছেলে, বাবা যখন বাড়িতে না থাকে তখন সে বাবার টেবিলে খেলতে ভালবাসে, তারপর বাবা যখন ফিরে দেখে যে টেবিলের এই অবস্থা তখন অন্য কিছু না ভেবেই আরিয়ানকে মারতে শুরু করে, ও তার মায়ের উপর ও চিৎকার করতে থাকে যে কেন সে আরিয়ানকে চোখে চোখে রাখেনি । আরিয়ানকে না মেরে তার বাবা আর কি কি করতে পারেঃ

- আরিয়ানের সাথে কথা বলতে পারে।
- কেন আরিয়ানের ঐ টেবিলটা এত পছন্দ।
- আরিয়ানের জন্য এরকমি আলাদা একটি টেবিল বানিয়ে দেওয়া যায় যেখানে তার বাবার কিছু বাদ দেওয়া জিনিস ও খেলার জিনিস থাকবে।
- আরিয়ানকে বলতে হবে ওগুলো নিয়ে সে খেলতে পারে
- তাকে বোঝাতে হবে যে অফিসের কাগজপত্র দরকারী সেগুলোতে হাত দিতে নেই

এইভাবে তার বাবা তার জন্য একটা সীমা বেঁধে দিতে পারে

সাধারন নিয়মানুবর্তিতার কিছু বিষয়:

- কোলাহলপূর্ণ ও নরম না হয়ে একটু শক্ত ও দৃঢ় হওয়া দরকার।
- অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মানসিক মেজাজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- অনমনীয় বা কঠোর না হয়ে যুক্তিসঙ্গত হওয়া ভাল।

বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যাগুলোর সাথে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় ?

- বয়ঃসন্ধিকালকে ঝড়-ঝাপটা বা মানসিক চাপের সময় বলা হয়, আর এটা শুধু তাদের জন্য নয় তার আশেপাশের লোকজন যেমন- শুশ্রূষাকারীরা অভিভাবকদের জন্যও ।
- তারা অনেক রকমের সমস্যা নিয়ে আসে ও কারুর পরামর্শও নিতে চায় না।
- এই সময় তাদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ও যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

- তাদের মধ্যে দৈহিক গঠন নিয়ে একটা পরিচয় সংক্রান্ত সংকট দেখা যায়। শুশ্রূষাকারী বা অভিভাবকদের এই সময় খুব সতর্কতার সাথে তাদের সাথে চলতে হবে।
- তারা এই সময় সবার থেকে ভালবাসা ও সহানুভূতি আশা করে যাতে তারা নিজেদেরকে ঠিক মত চালনা করতে পারে।

➢ <u>যোগাযোগব্যবস্থার বা পারস্পরিক আদান-প্রদানের ধরনের পরিবর্তন:</u>

- অনেকসময়ই কিশোর-কিশোরীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তারা তাদের সমস্যাগুলি বড়দের সাথে বলতেও চায় কিন্তু তারা হয়ত সবসময় সাহায্য চায় না। বরঞ্চ এটা চায় যে অভিভাবকরা তার আশেপাশেই থাকুক যাতে তারা নিজেরাই সমস্যার কোন সমধান বের করতে পারে।
- প্রায়ই বাবা মায়েরা বা শুশ্রূষাকারীরা নালিশ করে যে আগে সে এরকম ছিল না , সে এখন বেশি জেদী হয়ে উঠছে , তাদের কথা শুনছে না যা তাদের পরামর্শ মত চলছে না। অভিভাবকদের বুঝতে হবে তারা যখন আরও ছোট ছিল তখন তাদের পরামর্শ দরকার ছিল, কিন্তু এখন তারা যত বড় হচ্ছে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ধরণের অনেক পরিবর্তন আসছে, বাবা মা তাকে মতামত দিতে পারেন কিন্তু তাদের যেটা ঠিক মনে হবে সেটাই করতে পছন্দ করবে।
- তারা নিজেদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করলেও তারা কিন্তু অনেক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে ও তাদের সমর্থন পছন্দ করে। তাই প্রয়োজন না হলে তাদের উপর সমাধান চাপিয়ে না দিয়ে শুধু তাদের পাশে থাকা ভাল যাতে তারা নিজের সমাধান নিজেই খুঁজে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাঁতে পারে।

উদাহরনঃ একজন ১৩ বছরের মেয়ে তার মাকে এসে জিজ্ঞেস করে কাল স্কুলে অনুষ্ঠানে সে কোন জামা পরবে। মা হয়তো ভাববে সে কোন একটা নির্দিষ্ট উত্তরই আশা করছে, তাই মা তাকে বলল "তুমি এই জামাটা পরো"। তারপর মেয়েটির পছন্দ না হলে মেয়েটি হয়তো রেগে গিয়ে বলবে " আমি আর অনুষ্ঠানে যাবই না কারন মা তোমার পছন্দ খুব একঘেয়ে, আমি এটা পরবো না।"

এই সময় কিশর-কিশরীদের বুঝতে পারা খুব শক্ত। তাই তাকে এরম ভাবে বলা ভাল যে" তুমি কি পরতে বেশি আগ্রহী , সালোয়ার না স্কার্ট? "। আর এইভাবেই তাদের পরিচালনা করা দরকার।

➢ <u>সিদ্ধান্ত গ্রহন (Decision Making) :</u>

এই সময় ছেলে মেয়েদের পারিবারিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে তাদেরও অংশগ্রহন করানো দরকার যাতে তারা জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে নিজেরাই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে ও ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ভাবতে পারে। কিন্তু তাদের সবসময় কিছু বিকল্প দিয়ে দেওয়া হয় ও বলা হয় তার মধ্যে যেটা তার সঠিক মনে হচ্ছে সেটা বলতে বলা হয়। যেমন- বাবা তার ছেলেকে বলল যে এবার ছুটিতে তারা ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছে, কোথায় যাওয়া যায় - দার্জিলিং, সিমলা না কাশ্মীর ? তাই সে নিশ্চয়ই সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার কথা বলবে না। আর বাবা মায়ের উচিত তার পছন্দকে সম্মান করা।

➢ <u>কাজের খরচ ও সুবিধার বিশ্লেষণ (Cost- Benefit analysis):</u>

এই বয়সে ছেলে মেয়েরা সহজে অভিভাবকের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না। অভিভাবকদের উচিত তাদের সাথে বসে বিভিন্ন কাজকর্মের ভাল খারাপ দিকগুলো বুঝিয়ে দেওয়া। যেমন- একজন ১৫ বছরের ছেলে বাবা মায়ের কাছে একটা মোবাইল কেনার আবদার নিয়ে এল যেহেতু তার বন্ধুরাও মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। বাবা মায়ের তখন কম বয়সে মোবাইল ব্যবহারের সুবিধা- অসুবিধা গুলো তাকে বোঝানো উচিত। এমনকি অভিভাবকদের উচিত সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের ছেলে মেয়েদের যৌনতা ও নেশাগ্রস্ত জিনিস খাওয়ার ভাল খারাপ দিকগুলোও বুঝিয়ে দেওয়া। এছাড়াও অভিভাবকদের বিভিন্ন খারাপ কাজের ভাল- মন্দ দিক গুলো ছেলে মেয়েদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এদেরকে ঠিকমত ভালবাসা দিয়ে বুঝিয়ে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

➢ <u>সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (Problem Solving Skill):</u>

একজন ১৬ বছর বয়সের মেয়ে মায়ের কাছে এসে কাঁদছে কারন স্কুলে তার প্রিয় বন্ধু তার সাথে কথা বলছে না ও অন্য কোন মেয়ের সাথে বেশি কথা বলছে। তাই মেয়েটি আর স্কুলে যেতে চাইছে না আর ঘুমাচ্ছেও কম। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বাবা মা ঐ মেয়েটির বাবা মাকে নালিশ করে বা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক্ষেত্রে উচিত ছেলেমেয়েদের ঝামেলা তাদের নিজেদেরই মেটাতে দেওয়া। এই কিশোর-কিশোরীদের উপেক্ষা না করে তাদের সমস্যা নিজেদেরই মেটাতে দেওয়াই ভাল। অভিভাবক হিসাবে আপনার উচিত তাদের সামনে কিছু প্রশ্ন রাখা যেগুলি তাকে সঠিক সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন- তুমি কি ভাবছ ওকে বাড়িতে ডাকলে সমস্যার সমাধান হবে ? বা বাড়িতে খেতে ডাকলে বা শুধু ক্ষমা চাইলেই সমস্যার সমাধান হবে?

➢ <u>কিশোর-কিশোরীদের দাবী পূরণে সাহায্য করাঃ</u>

এক দম্পতির ১৭ বছরের ছেলে আছে। তাদের বাড়ি থেকে প্রায়ই টাকা চুরি হচ্ছে। তারা তাদের ছেলেকে সন্দেহ করছে না কারন সে আচরণগত দিক থেকে ও পড়াশোনাতেও খুব ভাল। একদিন তার বাবা মা তার বাবার ব্যাগ থেকে চুরি করতে দেখে ও ভীষণই হতাশ হয়ে পরে। এরপর তার জানতে পারে যে তাদের ছেলেকে তার ক্লাসের ২ জন ছেলে এই চুরি করতে বাধ্য করে। ছেলেটি চাপা স্বভাবের হওয়ায় কাউকে কিছু বলেনি ও তাদের কথাই শুনে চলে। এই ক্ষেত্রে ছেলেটিকে দৃঢ় হয়ে প্রতীবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু সে সেইরকম স্বভাবের নয়। এই ভাবেই এই বয়সের শিশুরা ধূমপান করতে, অন্যান্য নেশাগ্রস্ত জিনিস খেতে শেখে।

নোট- অভিভাবকরা চায় তার ছেলে মেয়েরা বাধ্যগত হোক কিন্তু এর সাথে সাথে তাদের শিশুদের শেখানো উচিত কিভাবে নিজেদের প্রাপ্য জিনিসগুলো পাবে, বা কেউ যেন কোনভাবে তার সুযোগ নিতে না পারে।

➢ <u>নৈরাশ্য ও প্রত্যাখ্যান পরিচালনায় সাহায্য করাঃ</u>

একজন ১৬ বছরের ছেলে বাড়ি থেকে পালানোর সময় স্টেশনে ধরা পরে। সে শহরের এক ভাল ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র। গত সপ্তাহে তার পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে ও সে খুব ভাল নম্বর পাইনি। তাইজন্য সে খুবই হতাশ এমনকি কয়েকদিন ধরে ঠিকমত খেতে ও ঘুমতেও পারছে না। তার বারবার এটাই মনে হচ্ছে কি করে সে স্কুলের বন্ধু ও বাবা মাকে মুখ দেখাবে।

সে এতটাই নৈরাশ্য ও হতাশাবোধে ভুগছিল যে সে বাড়ি ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই সব ক্ষেত্রে বাবা মাকে ও শুশ্রুষাকারীদের অনেকটা সহানুভূতিশীল হতে হয়। তাদের দূরে সরিয়ে না দিয়ে তাদের পাশে থেকে

তাদের হতাশাকে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। বাবা মাই সব থেকে বেশি তার ছেলে মেয়েকে বুঝবে ও সে যাতে হতাশ না হয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় কিভাবে ভাল ফলাফল করতে পারবে তাতে উৎসাহ জোগান ও সাহায্য করা উচিত।

ছোটবেলা থেকেই শিশুদের শেখাতে হবে নম্বরের উপর অত জোর না দিয়ে কিভাবে বেশি শেখা যায় সেটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া ও তার সাথে সাথে পড়াশোনাটাকে মজা সহকারে শিখতে হবে। আমাদের সমাজে জ্ঞানের থেকে বেশি নম্বর পাওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুরা কিভাবে হতাশাজনক পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবে তা অভিভাবকদের শেখাতে হবে। অনেক সময়তেই এইসব ছেলে মেয়েরা তাদের চাহিদামত কিছু না পেলে অন্যের বা নিজের ক্ষতি করে। যেমন- পরীক্ষায় ভাল নম্বর না পেলে বা ফেল করলে, প্রেমে ব্যর্থ হলে, কোন সম্পর্ক ভাঙলে তাদের মধ্যে হতাশা, রাগ, নিজেকে ও অন্যকে ক্ষতি করার প্রবনতা দেখা যায়।

অভিভাবকদের কি কি বুঝতে হবে?

- আপনই যদি বন্ধুত্বপূর্ণ হন; কম কঠোর ও নিয়ন্ত্রন করেন তাহলে শিশুকে পরিচালনা করা অনেক সহজসাধ্য হবে।
- তাদের আবেগ ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হতে হবে।
- একি সঙ্গে আপনাকে একটু শক্তও হতে হবে।
- শিশুদের আবেগগুলি যাতে সহজে প্রকাশিত হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।
- শিশুর পাশে থেকে তাকে সঠিক পথ দেখান।
- শিশুকে জীবনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। যা হারিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি সে জীবন থেকে পেতে পারে তাকে সেটা বোঝাতে হবে। আত্মহত্যা, অন্যের ক্ষতি করাই কোন সমাধান নয় সেটা তাকে বোঝাতে হবে
- যৌনতা ও নেশাগ্রস্ত হওয়ার খারাপ ভাল দিকগুলো তাকে দেখাতে হবে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্নরকম সমস্যা সনাক্তকরনঃ

জেদ (Stubbornness):

জেদ কাকে বলে ?

শিশুদের মধ্যে জেদটা খুবই লক্ষনীয় আচরণ। তাকে যেটা করতে বলা হয় সে অনবরত সেটা করতে মানা করে বা করতে চায় না। এটা অল্প সময়ের জন্যও হতে পারে আবার অনেকক্ষণ ধরেও চলতে থাকে।

জেদের প্রারম্ভের সময় কখন ?

ছোটবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে জেদ দেখা যায়। দুবছর বয়সের আগে শিশুর মধ্যে জেদ দেখা যায় না। কারন সে তখন তার চাহিদা পূরণের ব্যাপারে মা বা শুশ্রুষাকারীর উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল। তাই তখন তারা অনেকটা নমনীয় ও নির্ভরশীল হয়।

জেদের প্রথম স্তর দেখা যায় শিশুর দুবছর বয়সের পর বা তিন বছরে যখন সে হাঁটতে ও কথা বলতে পারে। তখন তাদের মধ্যে স্বাধীনতার অনুভূতি দেখা যায় ও সে আরও অনেক বেশি করে প্রত্যক্ষন করতে পারে।

এরপর দ্বিতীয় স্তরে শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায় তখন তার মধ্যে আরও জেদের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এরপর তারা সময়ের সাথে সাথে বুঝতে শেখে যে কোনকিছু পাওয়ার জন্য জেদ দেখানোটা একমাত্র পথ নয়। অভিভাবক যদি তাদের সাথে নমনীয় হয়ে তাদের বুঝতে চায় তাহলে তারা আরও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন- মিতার যখন ৮ বছর বয়স তখন সে খুব জেদী ছিল তার বাবা মা তাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল, যখন দরকার হত তার বাবা মা আবার তাকে বুঝত, তাই সে যখন বড় হল সামাজিক রীতি নীতি গুলো বুঝতে শিখল তখন আস্তে আস্তে তার মধ্যে থেকে জেদটা কমে গেল।

জেদ কি কি ধরণের হয়?

স্থিরীকরণ ও ইচ্ছার জেদ (Stubbornness of Determination and Will) :

এই ধরণের জেদকে সমর্থন করা হয় ও উৎসাহ দেওয়া হয়। যেমন- শিশু একটি খেলনা নিতে চায় , সে খেলনাটি নিতে যাওয়ার সময় খেলনাটি সরে যায় , সে খেলনাটি নেওয়ার জন্য সমানে চিৎকার করতে থাকে ও যতক্ষন না সে খেলনাটি হাতে পায় বার বার চেষ্টা করতে থাকে।

জেদ যেখানে সচেতনতার অভাব থাকে (Stubbornness of Consciousness) :

এখানে শিশু জেদের ফলাফল কি হতে পারে সেটা না দেখেই কোন কিছু পেতে জেদ করতে থাকে। যেমন- শিশুটি বার বার টিভি দেখার জন্য জেদ করতে থাকে যেখানে তার মা তাকে ঘুম পারানোর চেষ্টা করছে কারন সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয়।

নিজস্বতার জেদ (Stubbornness with oneself):

অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজের সাথে জেদ করে। যেমন- একটি ক্ষুধার্ত শিশু নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না খেয়ে আছে, মা অনেকবার জোর করাতেও সে শুনছে না।

জেদ একটি আচরণগত সমস্যা বা ব্যাধি (Stubbornness is a Behaviour Disorder):

কোন কোন শিশু আচরণগতভাবেই জেদী। সে সব ব্যাপারে অন্যের সাথে জেদ করে।

শারীরিক জেদ (Physiological Stubbornness) :

কোন কোন শিশুর মস্তিষ্কের কিছু সমস্যা থাকার ফলে তারা স্বভাবগতভাবেই জেদী।

জেদের বিভিন্ন কারণগুলি কি কি ?

জেদ অতিরিক্ত মাত্রায় না হলে সেটা ক্ষতিকর না , জেদ অনেকসময় আত্মবিশ্বাসও বাড়াতে সাহায্যকারী ।

- বড়দের নির্দেশ: অনেক সময় বড়রাই বাস্তবটা চিন্তা না করে, ফলাফল না দেখে শিশুকে এমন কিছু করতে বাধ্য হয় ও সে তখন কোন ব্যাপারে জেদী হয়ে ওঠে। যেমন- একজন মা তার শিশুকে একটি ভারী কোটটা পরতে বাধ্য করছে কিন্তু শিশুটি সেটা পরতে চাইছে না কারন এটা পরার জন্য সে হয়তো বন্ধুদের সাথে দৌড়ানোতে হেরে যাবে, বা কোটটা তার স্কুলের ড্রেসের সাথে একদম বেমানান , কিন্তু মা এগুলো না বুঝেই তাকে পরাতে চাইছে, এওরপর শিশুটি না পরার জন্য আরও জেদ করবে।
- বড়দের অক্ষমতাঃ অনেকসময় বাবা মায়েরা শিশুদেরকে কোন কাজ করতে আদেশ করে, তাকে করতে বাধ্য করে, কিন্তু তাকে একবারও কারণটা বুঝিয়ে বলে না।
- শিশু নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করতে চায়: শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে একটা মানসিক পরিপক্কতাও আসে। একটু বড় হলে সে অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য জেদ দেখায়। পরে আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে যে জেদ দেখনোটা কোন কিছু পাওয়ার জন্য ঠিক উপায় নয়।
- অভিভাবকদের ক্রমাগত মধ্যস্থতা ও চিকিৎসার অনমনীয়তা: একটি শিশু সবসময় খারাপ ভাবে কথা বলাটাকে অপছন্দ করে, কেউ তার সাথে ভালভাবে মিনতি করে কথা বলুক সেটাই চায়। কেউ তাকে জোর করে বাধা দিলে সে ঐ বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য জেদকেই অবলম্বন করে।
- নির্ভরশীলতা: যারা মা বা অন্যদের উপর যতবেশি নির্ভরশীল হয় তারা বেশীমাত্রায় জেদী হয়।
- অসহায়ত্বার অনুভূতিঃ শিশু যদি ছোট থেকেই বিভিন্ন রকম মানসিক বা শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয় বা কোন খারাপ অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে ঐ শিশুর জেদি হওয়ার একটা প্রবনতা থকে।
- জেদের আচরণকে সমর্থন করা ও তাতে প্রতিক্রিয়াও করা: শিশু যখন জেদ করে তখন তার ঐ আচরণকে যদি সমর্থন করা হয় ও সেইমত প্রতিক্রিয়া করা হয় তাহলে তার মধ্যে জেদটাও বেড়ে যায়।

একটি জেদি শিশুকে কিভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয় ?

অভিভাবকরাই শিশুর মধ্যে জেদ বপনে প্রথম কারন। শিশু যখন জন্মায় তখন সে জেদ সম্বন্দে কিছুই জানে না। মায়েরা শিশুকে ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে কিন্তু শিশু যখন তার সব চাহিদা জাহির করে তখন মায়েরা সেটা করতে দেয় না , ফলত শিশুর মধ্যে একটা জেদ দেখা দেয়ঃ

১। শিশুকে কোনকিছু করতে বাধ্য না করাই ভাল। ছোট ছোট জেদকে অনেক সময় গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শিশুর যে চাহিদা ক্ষতিকর নয় এবং সমর্থনযোগ্য সেগুলি পূরণ করা হয়।

২। ছোট বাচ্চা হলে তাকে কোন খেলনা বা কাজের জিনিস দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে, বড়দের ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৩। প্রথমদিকে ভালবাসাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক সময় জেদ কমাতে পারে।

৪। প্রাথমিক স্তরে শাস্তি দেওয়াই জেদ কমানোর উপায় বাবা মাকে এটা জানতে হবে তার শিশুর জন্য কোন শাস্তিটা উপযোগী।

৫। কোন জিনিস না পাওয়া, বাড়ির বাইরে বেরোতে না দেওয়া এগুলি একটি শিশুর ক্ষেত্রে উপযোগী কিন্তু অন্য শিশু এক্ষেত্রে এটা উপযোগী নাও হতে পারে। শিশুকে মারা বা অপমানজনক কথা বলা কখনই ফলপ্রসূ হয় না।

৬। অভিভাবকদের শিশুকে এমন কিছু করতে না বলাই ভাল যেটা তারা জানেই যে শিশুটি করবে না , তাহলে শিশুটির আরও জেদ বাড়বে।

৭। শিশুকে অন্য শিশুদের সামনে জেদি বলা উচিত না।

৮। শিশু যখন ভাল কিছু করে তাকে প্রশংসা করা দরকার।

৯। আপনাকে বুঝতে হবে যে জেদি শিশুকে পরিচালনা করা এত সহজ নয় , এরজন্য ধৈর্য, জ্ঞান ইত্যাদি অনেক কিছুর দরকার।

ক্রোধ (Temper Tantrum):

ক্রোধ কাকে বলে?

ক্রোধ হল হটাৎ করে আশা প্রচণ্ড রাগের বহিঃপ্রকাশ। এটা শুধু কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য করা হয় তা নয়। শিশুরা এই সময় প্রচণ্ড কাঁদে, চিৎকার করে, হাত-পা ছুরতে থাকে। প্রথমদিকে এই ক্রোধ মোটামুটি ৩০ সেকেন্ড বা ২ মিনিটের জন্য থাকে।

কিন্তু কখন কখনও এই ক্রোধ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। তখন শিশুর কোধ এতটাই তীব্র হয় যে সে মারে, কামড়ায়, খিমচে নেয়। এই সময় সে যে নিজেকে বা অন্যকে আঘাত করছে সেটা খুবই সমস্যাজনক।

১ থেকে ৪ বছরের শিশুর মধ্যে ক্রোধ বেশি দেখা যায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও এই ক্রোধ দেখা যায়।

শিশুদের মধ্যে কেন ক্রোধ দেখা যায়?

- শিশুকে যখন তার পছন্দের কোন জিনিস নিতে বা নতুন কিছু শিখতে বাধা দেওয়া হয় তখন সে যে ক্রোধ দেখায় সেটা স্বাভাবিক। কারন তার কাছে নৈরাশ্য বা হতাশাবোধ দেখানোর আর অন্য কোন রাস্তা থাকে না যেমন- শিশু যখন নিজের জামার বোতাম লাগাতে চায় কিন্তু ব্যর্থ হয় তখন তার মধ্যে ক্রোধের বিকাশ ঘটে।
- যদি কোন শিশু ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়।
- যদি শিশুর থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া হয়।
- শিশুর বয়স।
- শিশুর মানসিক চাপের মাত্রা।
- যখন শিশুর মধ্যে তার অনুভূতি প্রকাশ করার মত শব্দ গঠনের ক্ষমতা আসে না তখন সে ক্রোধের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।
- যখন শিশুর মধ্যে অন্য কোন দৈহিক, মানসিক বা প্রাক্ষোভিক সমস্যা থাকে।
- অভিভাবকের শিশুর প্রতি ব্যবহার। অভিভাবক যদি শিশু কোন কাজ ভাল করে না করতে পারার জন্য অভিভাবক তার সাথে খুব কড়া ভাবে সবসময় কথা বলে তখনও তার মধ্যে ক্রোধের বিকাশ ঘটে।

ক্রোধের সাথে কি কি ভাবে মোকাবিলা করা যায়?

ক্রোধের সাথে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তা দেখে নেওয়া যাকঃ

- যে পরস্থিতিতে ক্রোধের বিকাশের সম্ভাবনা থাকে সেটি এড়িয়ে চলা ভাল।
- শিশুর সাথে ভাল ব্যবহার করা দরকার। ভুল করলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাকে প্রতিদিনের একটা রুটিন বানিয়ে দিলে ভাল
- শিশুকে কোন খেলনা বা খাবার জিনিস দিয়ে ব্যস্ত রাখা দরকার।
- সবসময় আপনি বেরোনোর আগে দেখে নিন আপনার শিশু ঠিকমত খেয়েছে ও ঘুমিয়েছে কিনা।
- শিশুর কাছ থেকে তার পছন্দের চকলেট, বা অন্য জিনিসপত্র একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যাতে সে অসময়ে সেটা নেওয়ার জন্য বায়না না করে।
- শিশুকে কখনও কখনও নিজের পছন্দটা বেছে নিতে দিন। যেমন- সে কি খেতে চায়, কোন বইটা পড়তে চায়। তাতে শিশুটির মনে মনে তার নিজের জীবনের উপর কিছুটাতে নিয়ন্ত্রণ আছে।
- কখনও কখনও শিশুর কিছু আবদার শুনলে সেরম কোন ক্ষতি হয়না। যেমন- ৩০ মিনিট ধরে তার কান্না থামানর থেকে আরও ১৫ মিনিট বেশি সময় তাকে টিভি দেখতে দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।
- শিশু যদি কোন বিষয় নিয়ে রেগে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে তখন কোনভাবে যদি তাকে অন্য জিনিস নিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় তাআহলে তার রাগটা ক্রধে পরিনত হবে না। যেমন- তার মন পরিবর্তন করার জন্য তাকে বাইরে ঘুরে নিয়ে যাওয়া, হাসির কথা বলা, বালিশ নিয়ে খেলা করা যাতে তাকে ঐ রাগের বিষয়টি ভোলান যায়।
- শিশুকে শেখাতে হবে সে অন্য কোনভাবে তার নৈরাশ্য বা হতাশা প্রকাশ করতে পারে। যারা একটু বড় তারা অযথা কান্নাকাটি না করে মুখে বলে শব্দ দিয়েও তার হতাশা প্রকাশ করতে পারে।

মিথ্যে বলা ও চুরি করা:

কেন শিশুরা মিথ্যে বলে ও চুরি করে ?

শিশু ছোট বয়সে মিথ্যে বলে ও চুরি করে কারন তার কাছে এর থেকে আর বেশি ভাল উপায় জানা থাকে না। তাদের মধ্যে এই সময় ভাল মন্দের জ্ঞান থাকে না। কিন্তু শিশু কেন মিথ্যে বলছে বা চুরি করছে সেটা তার বয়সের উপর নির্ভর করছে. শিশু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন কারনে মিথ্যে কথা বলে।

৩ বছর বয়সের মধ্যে:

- কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই মিথ্যে বলে।
- তারা কি বলছে নিজেরই বুঝতে পারে না।
- নতুন কোন বিষয় শিখলে বা নতুন ভাষা চর্চা করার জন্যও মিথ্যে বলে বানিয়ে বানিয়ে।
- তাদের মধ্যে নীতিগত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না
- কোনটা নিজের আর কোনটা নিজের নয় সেটা বুঝতে পারে না।

৩-৫ বছরের শিশু:

- অনেক সময় বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।
- বেশিরভাগ সময় একটি কল্পনা বা রূপকথার জগতে থাকতে ভালবাসে।
- কখনও এমনি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলে।

যখন কোন জিনিসের মূল্য বুঝতে পারে না।

৬-১২ বছরের শিশুঃ

- এই বয়সে শিশু বোঝে মিথ্যে কথা বলাটা ভাল ব্যাপার না।

কি কারনে শিশু ও কিশোর- কিশোরীরা মিথ্যে বলে ?

- তাদের উচ্ছাকাঙ্খা পূরণের জন্য মিথ্যে বলে।
- বয়ঃসন্ধিকালে বন্ধুদের চাপে মিথ্যে বলে।
- অন্যদের হতাশ করার জন্য মিথ্যে বলে ।
- যাদের আত্মসম্মানবোধ কম তারা চুরি করে।
- শিশু এমন কিছু কাজ করেছে এবং সে কি কারনে করেছে সেটা বলতে গিয়ে অনেক সময় মিথ্যে বলতে হয়।
- বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য অনেকে মিথ্যে বলে।
- নিয়মানুবর্তিতার অভাব থাকলে ব্যক্তি মিথ্যে বলে
- ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা মতামতের অভাবে অনেকে মিথ্যে বলে।
- অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মিথ্যে বলে।

শৈশব ও কৈশোরকালে শিশুদের মিথ্যে বলা ও চুরি করাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

তাদেরকে সত্যি কথা বলার জন্য উৎসাহী করতে হবে। কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

- যেসব পরিস্থিতিতে শিশু মিথ্যে বলতে পারে সেইসব পরিস্থিতি যাতে সে এড়িয়ে চলতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন- যদি আপনার শিশু মাটিতে দুধ ফেলে দেয়, সেইসময় তাকে জিগেস করলে সে হয়তো বলবে যে সে এটা করেনি কারন সে ভাবছে সত্যি বললে মার খাবে বা বকুনি খাবে, তাই মা তাকে জিগেস না করে যদি শুধু এটা বলে দুধটা হয়তো দুর্ঘটনাবশত পড়ে গেছে, তাহলে তার মিথ্যে বলার পরিস্থিতিই তৈরি হবে না।
- শিশু যদি অনবরত আপনাকে মিথ্যে বলে তাহলে ওকে বোঝাতে হবে কেন মিথ্যে বলাটা ঠিক না , বা আপনি কিন্তু তাকে ভবিষ্যতেও আর বিশ্বাস করতে পারবেন না।
- যদি আপনার শিশু অভ্যাসবশত মিথ্যে বলে তাহলে তাকে বোঝাতে হবে এরকম মিথ্যে বললে তার ফলাফল কি হতে পারে। তাকে এই বদ অভ্যাসটি ছাড়াতে সাহায্য করতে হবে।
- শিশু যদি মিথ্যে বলে তাহলে তাকে বার বার মিথ্যুক বললে তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগতে পারে ও আরও খারাপ ফলাফল হতে পারে। তাই সে মিথ্যে বললে তার আচরণটা শুধরে দিতে হবে।

- শিশুকে মিথ্যে বলা থেকে বিরত রাখার আর একটি উপায় হল সে যে মিথ্যেটি বলেছে সেটা নিয়ে ঠাট্টা বা মজা করা, তাহলে শিশু তখন বুঝবে যে সে ধরা পরে গেছে, তারপর বড়রা তাকে সহজেই বোঝাতে পারবে যে এই মিথ্যেটা বলার কোন দরকার ছিল না।
- শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে মিথ্যে বলাটা তার একটা অভ্যাসে দাড়িয়ে যেতে পারে। তখন তাকে ভালভাবে বোঝাতে হবে মিথ্যে বলাটা কিভাবে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলবে, তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা তাকে আর বিশ্বাস করবে না।
- শিশুর সাথে সবসময় থেকে তাকে সত্যি বলতে উৎসাহ যোগাতে হবে।

পলায়নপ্রবৃত্তি (Truancy):

পলায়নপ্রবৃত্তি হল কারুর অনুমতি ছাড়াই স্কুল বা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা (বিশেষ করে স্কুল থেকে)।

পলায়নপ্রবৃত্তির প্রধান কারণগুলি কি কি?

নিম্নোক্ত কিছু কারনে শিশুর মধ্যে পলায়নপ্রবৃত্তি দেখা যায়।

মন্দ বা খারাপের প্রভাব বা সঙ্গদোষঃ

পলায়নপ্রবৃত্তির প্রধান কারন হল খারাপ সঙ্গদোষ । বন্ধুদের মধ্যে এটা শিশুর মর্যাদা বাড়ায়। এই সমস্যাটির সমাধান করা সহজসাধ্য নয়। অনেক স্কুলে কম উপস্থিতির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, যাতে ছাত্ররা বেশি করে স্কুলে উপস্থিত থাকে । কিন্তু এটা অনেক সময়তেই একেবারে নির্মূল করা যায় না।

স্কুলের পড়াশোনার অনুপযোগিতা:

স্কুলে উপস্থিত থাকাটা ছাত্রদের জন্য একান্ত কাম্য কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্ররা অনেক সময় স্কুলে না গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। তারা মনে করে স্কুলের থেকে সেরকম ভাল কিছুই শেখার নেই, তারা কাজের কিছু শেখাচ্ছে না। এইসব ছাত্ররা মনে করে তারা জানে তারা স্কুল থেকে বেরিয়ে কি করবে। এতে স্কুলের কোন ভূমিকা নেই।

স্কুলের সাথে খারাপ সম্পর্ক:

স্কুলে কোন শিক্ষকের সাথে খারাপ সম্পর্ক থাকলে অনেক সময়তেই ছাত্ররা স্কুলে যেতে চায় না। যেমন- ত্রিশা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তো তখন তার বিজ্ঞান শিক্ষকের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল না আর তাই জন্য সে স্কুলে যেতে চাইত না, কিন্তু সে এখন অষ্টম শ্রেনীতে পড়ে ও রোজ স্কুলে যায়, কারন এখন অন্য একজন বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন। তিনি এখন আর নেই ।

উৎপীড়ন:

যদি শিশু স্কুলে বা স্কুলে যাওয়া-আসার পথে সুরক্ষিত না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি থাকতে পারে। বিভিন্ন স্কুলেই এই উৎপীড়ন একটি বড় সমস্যা। স্কুলের পরিবেশ অনেক বেশি সুরক্ষাদায়ক ও সমর্থনযোগ্য হতে হবে যাতে

কেউ যদি এই উৎপীড়নের স্বীকার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে গভীরে গিয়ে সাবধানতার সাথে ব্যাপারটা পরিচালনা করতে হবে।

ব্যক্তিগত ব্যাপারঃ

অনেক ছাত্রই তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য স্কুলে উপস্থিত থাকে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য অনেকসময়েই স্কুলের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। পরীক্ষায় খারাপ ফল, মানসিক স্বাস্থ্য, নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্তি, স্কুলের পরাশোনা বুঝতে না পারা ইত্যাদি কারন হতে পারে।

অভিভাবকঃ

অনেকসময়েই বাবা মায়েরাই শিশুদেরকে যখন তখন ছুটি নিতে বাধ্য করায়। এই আচরণগুলি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় , ছাত্র ও তার বাবামায়েদের বুঝতে হবে এই আচরণ কেন শিশুদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক।

কিভাবে পলায়নপ্রবৃত্তি কমানো যায়?

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে যে যদি স্কুলের পরিবেশের উন্নতি করা যায়, সুরক্ষিত করা যায়, পড়াশোনার মানের উন্নতি করা যায় তাহলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। ছাত্র ও অভিভাবকদের নানভাবে স্কুলের সাথে যুক্ত রাখা দরকার, ছাত্রদের কাছে স্কুলের পরিবেশ যাতে সুরক্ষিত, আরামদায়ক হয় সেদিকে নজর দিতে হবে ,তাহলে ছাত্রদের মধ্যে এই সমস্যা মেটানো যেতে পারে। The National Dropout Prevention Center/ Network (Smink and Reimer, 2005) এর মতে নিম্নোক্ত উপায়ে এই সমস্যা দূর করা যেতে পারেঃ

- নিয়মানুযায়ী পুনরায় নবীকরণ
- স্কুল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা
- সুরক্ষিত শিক্ষনের পরিবেশ
- পরিবারের ভূমিকা
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা
- স্বাক্ষরতার উন্নয়ন
- পরামর্শদান ও শেখানো
- পরিসেবার শিক্ষা
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিকল্পব্যবস্থা
- স্কুল থেকে প্রাপ্য সুবিধা
- পেশাদারী উন্নয়ন
- শিক্ষনপ্রক্রিয়া
- শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তি
- ব্যক্তিগত নির্দেশ
- পেশা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা

উৎপীড়ন (Bullying):

উৎপীড়ন হল অবাঞ্ছিত, আক্রমণাত্মক আচরণ। স্কুলে যাওয়া শিশুদের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। এই সমস্যামূলক আচরণ শিশুর মধ্যে বারবার দেখা দিতে পারে যে শিশু এই উৎপীড়নের স্বীকার হয় আর যে শিশু উৎপীড়ত হতে পারে তাদের দুজনের জন্যই এটি মারাত্মক একটি সমস্যা তাদের আচরণগুলি হয়ঃ

- ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাঃ শিশুদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। তারা নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য, জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য অন্যদের আঘাত ও ক্ষতি করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই ব্যক্তির উপর তাদের ক্ষমতা জাহিরের পদ্ধতি আলাদা হতে পারে।
- পুনরাবৃত্তিঃ এই আচরণ শিশুদের মধ্যে একের বেশি সময় দেখা যেতে পারে। কাউকে হুমকি দেওয়া, কারুর ব্যাপারে গুজব ছড়ানো, কাউকে শারিরিক বা মানসিকভাবে আক্রমন করা, কাউকে কোন দল থেকে বের করে দেওয়া ইত্যাদি উৎপীড়নমূলক আচরণের মধ্যে পরে।

উৎপীড়নের প্রকারভেদঃ

এটি তিন ধরনেরঃ

- মৌখিকঃ নিষ্ঠুরভাবে কথা বলা ও লেখা
  - উত্যক্ত করা বা অপমান করা (ওজন, উচ্চতা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আচরণ ইত্যাদি নিয়ে)।
  - নাম ধরে ডাকা।
  - অশোভনীয় যৌন সংক্রান্ত কথা বলা।
  - বিদ্রূপ করা ।
  - ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া।
- সামাজিকঃ কারুর সামাজিক মর্যাদা বা সম্পর্ককে আঘাত করা।
  - কাউকে বের করে দেওয়া।
  - অন্য কারুর সাথে বন্ধুত্ব না করতে দেওয়া।
  - অন্যের ব্যাপারে গুজব ছড়ানো।
  - সবার সামনে কাউকে লজ্জিত বোধ করানো ।
  - কারুর পেছনে কথা বলা।
- দৈহিকঃ কারুর শরীরে আঘাত করা।
  - ঘুসি মারা, লাথি মারা।
  - থুতু ফেলা।
  - ধাক্কা মারা

- কারুর জিনিস নিয়ে নেওয়া বা ভেঙে দেওয়া।
- খারাপ কোন অঙ্গভঙ্গি করা।

কি কারনে শিশুরা এরকম উৎপীড়নের স্বীকার হয়?

এটা মনে রাখা দরকার কেউই এই উৎপীড়নের স্বীকার হওয়ার যোগ্য না। আপনার শিশু যদি এই রকম উৎপীড়নের স্বীকার হয় তাকে বোঝানো দরকার যে এটা তার ভুল নয় , যে এই অপরাধ করছে তার ভুল, সে অপরাধী। বয়স, চেহারা, সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে সব শিশুই এই অপরাধের স্বীকার হতে পারে। গবেষণা থেকে জানা গেছে যাদের ADHD, অ্যাস্পারজার, অটিসোম্ , লার্নিং ডিসঅর্ডার আছে সেইসব শিশুরা এই অপরাধের স্বীকার হতে পারে। কারন এই ধরণের শিশুদের সামাজিক বিকাশ অনেক ধীর গতিতে হয়।

কি কারনে শিশুর মধ্যে অন্যকে উৎপীড়নের প্রবনতা দেখা যায়?

এই শিশুরাও সমাজের যেকোনো স্তর থেকে আসতে পারে। তাদের প্রবনতা থাকে :

- অন্যের উপর কর্তৃত্ব করা।
- প্রচণ্ড আবেগপ্রবণতা।
- এদের মধ্যে রাগ, হতাশা,হিংসা ও অন্যান্য নেতিবাচক আবেগগুলি দেখা যায়।
- যারা একটু অন্য ধরণের শিশু তাদেরকে এরা সহ্য করতে পারত না ।
- এরা এমন পরিবার থেকে আসে যেখানে তারা কম ভালবাসা পায়।
- জোর করা, হুমকি দেওয়া এরকম অনেক ধরণের পথ তারা অবলম্বন করে।
- অনুমোদনকারী

কিভাবে উৎপীড়নকে প্রতিরোধ করা যায়?

আপনার শিশুও এই উৎপীড়নের স্বীকার হতে পারে। তাই এগুলো কিভাবে প্রতিরধ করা যেতে পারে সেগুলি জানা যাকঃ

- অভিভাবকদের এই উৎপীড়নের ব্যাপারে তাদের শিশুদের সাথে কথা বলা উচিত। যেমন- কেন এটা ভুল ও ক্ষতিকর, তারা যদি খুব কম বয়সেই কাউকে উৎপীড়নের স্বীকার হতে দেখে তাহলে তাদের কি করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলা দরকার।
- অভিভাবকদের উচিত বাড়িতে একটা সহনশীলতা, সম্মানজনক ও সমবেদনামূলক পরিবেশ গড়ে তোলা, কারন তারা যদি বাড়িতেই কাউকে এই অপরাধ করতে দেখে তাহলে তারাও সেটা শিখবে।
- শিশুদেরকে সবসময় বিশেষ করে স্কুলে বড়দের নজরে রাখতে হবে (বিশেষ করে খেলার মাঠে, বাসে, দুটো ক্লাসের মাঝামাঝি সময়ে)।
- স্কুলের শিক্ষকদের উচিত অভিভাবকদেরও এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করানো । যারা উৎপীড়ন করছে ও যারা উৎপীড়নের স্বীকার হচ্ছে দুজনের অভিভাবকদের সাথেই শিক্ষকদের কথা বলা দরকার।

স্কুল প্রত্যাখ্যান (School Refusal):

এক্ষেত্রে শিশু স্কুলে যাওয়াকে এড়িয়ে চলে , তার মধ্যে স্কুলের প্রতি একটা ভয় কাজ করে। এক্ষেত্রে শিশু এক দুদিন কোন কারনে স্কুলে গেল না তা নয়, স্কুলকে এড়িয়ে চলার প্রবনতা তার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। সে ক্রমাগত স্কুলে যেতে চায় না বা স্কুলে যাওয়ার কথা বললেই তার মধ্যে একটা উদ্বেগ দেখা যায়। অভিভাবক যত চেষ্টাই করুক কিছুতেই শিশুটি স্কুলে ঢুকতে চায় না।

স্কুল প্রত্যাখ্যানের কি কি সংকেত ও চিহ্ন শিশুদের মধ্যে দেখা যায় ?

শিশু যে স্কুলে যেতে চাইছে না বা স্কুল প্রত্যাখ্যান করছে সেটা অনেকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

- বিভিন্ন রকম শরীর খারাপের অজুহাত দেয়। যেমন- পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, শরীরটা ভাল লাগছে না আজ ইত্যাদি।
- স্কুলে আজ কিছু ঘটতে পারে এই নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগ দেখা যায় শিশুর মধ্যে।
- তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে যে যখন তারা স্কুলে থাকবে বাবা মায়ের যদি কিছু হয়ে যায়।
- পড়াশোনা শেখার ব্যাপারে কোন অসুবিধা , স্কুলে কোন শিক্ষকের সাথে খারাপ সম্পর্ক।

টেবিলঃ ৬ স্কুল প্রত্যাখানের কিছু প্রচলিত সংকেত

অন্তর্মুখী	বহির্মুখী
হতাশা	রাগ
ক্লান্তি	বড়দের সঙ্গে থাকা
ভয়	অন্যদের আশ্বাস পেতে চায়
সাধারন ও সামাজিক উদ্বেগ	অসম্মতি ও অবাধ্যতা
আত্ম সচেতনতা	সকালে উঠতে না চাওয়া
দেহগত সমস্যা	স্কুল বা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া
চিন্তন	মেজাজ দেখানো ও কান্নাকাটি করা

কেন শিশুরা স্কুলে যেতে চায় না?

- কখনও কখনও শিশুদের মধ্যে অনেক রকম মানসিক সমস্যা দেখা যায়, যেমন- ADHD,লার্নিং ডিসঅর্ডার ইত্যাদি। কিন্তু ছোটবেলা থেকে তাদের রোগ নির্ণয় না হওয়াতে তারা যত বড় হয় তাদের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এরফলে আরই স্কুলের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না তাই স্কুলে যেতেও চায় না ।
- অনেক সময় স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে সুরক্ষিত থাকে না, সেখানে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপীড়ন হওয়ার ফলে শিশুর মনে একটা ভয় জন্ম নেয়। এটা যদি অভিভাবক বা শিক্ষরা আগে থেকে না বুঝতে পারেন তাহলে তাহলে এর অনেক খারাপ ফল হতে পারে। এই সব ঘটনা শিশুর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে, ফলে তাদের মধ্যে অনেক সময় উদ্বেগ, নৈরাশ্য বা হতাশা দেখা যায়।

- স্কুলের অনেক বিষয় শিশুদের কাছে মানসিক চাপের কারন হয়ে ওঠে। পরীক্ষা, কোন অনুষ্ঠান, বেড়াতে যাওয়া, নাচ -গান ইত্যাদি অনেক শিশুর কাছে একটা মানসিক চাপ। কারন তারা ভয়, লজ্জা, অকারন অন্যের নজরে আশা, অনিশ্চয়তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায়।
- অনেক শিশু স্কুলে যাওয়া থেকে বাড়িতে থাকতে বেশি পছন্দ করে কারন বাড়ির পরিবেশ তাদের কাছে বেশি সুখকর। তারা ভাবে বাড়িতে থাকলে পছন্দের সিনেমা দেখতে পারবে, ভিডিও গেম খেলতে পারবে, পছন্দের ব্যক্তির সাথে সময় কাটাতে পারবে কিন্তু স্কুলে গেলে তারা এসবতো পাবে না।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরও কিছু উদ্বেগজনিত কারণও আছে। সেগুলি হল-

- **বিচ্ছিন্নতার উদ্বেগঃ**

  ছোট শিশুদের মধ্যে একটা উদ্বেগ কাজ করে যে তারা যদি স্কুলে যায় তখন বাবা মায়ের কি হবে, বাবা মায়ের যদি কিছু হয়ে যায়। তাই তারা স্কুলে যেতে চায় না। তারা মেজাজ দেখাতে থাকে , এমনকি স্কুলে পৌছে দিলেও পালিয়ে আসার চেষ্টা করে।

- **কাজ সম্পাদনের উদ্বেগঃ**

  অনেকসময় শিশুদের মধ্যে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষায় ভাল করে লিখতে পারবে কিনা, ক্লাসে ঠিক করে পড়া বলতে পারবে কিনা, না পারলে বন্ধু বা সহপাঠীরা কি মনে করবে ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা যায় ও তারা এসবের ভয়ে স্কুলে যেতে চায় না।

- **সামাজিক উদ্বেগঃ**

  যেসব শিশুর মধ্যে এইরকম উদ্বেগ থাকে তারা যেকোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন থাকে, তারা ভাবে কিভাবে বন্ধু বা শিক্ষকদের সাথে কথা বলবে।

- **সাধারন উদ্বেগঃ**

  এইসব শিশুদের গোটা জগৎ সম্বন্ধেই একটা ভয় কাজ করে। যখন সে স্কুলে থাকবে যদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় এরকম ধরণের ভয় কাজ করে।

পলায়নপ্রবৃত্তি ও স্কুল প্রত্যাখ্যানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

টেবিল- ৭ পলায়নপ্রবৃত্তি ও স্কুল প্রত্যাখ্যান নির্ধারণের মানদণ্ড

স্কুল প্রত্যাখ্যান	পলায়নপ্রবৃত্তি
• স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ, রাগ, হতাশা, দেহগত সমস্যা দেখা যায়।	• স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে অত উদ্বেগ বা ভয় থাকে না
• শিশু যে যে স্কুলে যাইনি বা যেতে চাইছে না সে ব্যাপার অভিভাবকরা জানে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা বাবা মাকে বোঝাতেও চায় যে তারা কেন স্কুলে যেতে চাইছে না।	• শিশুরা বাবা মায়ের কাছে স্কুলে না যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন রাখে।
• শিশুদের মধ্যে অপরাধমুলক আচরণ দেখা যায় না।	• শিশুদের মধ্যে অপরাধমূলক আচরণ দেখা যায়(যেমন- মিথ্যে বলা, চুরি করা)।
• স্কুলে না গেলে শিশু বাড়িতেই সুরক্ষিত পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে।	• স্কুলের সময়ে স্কুলে না গেলে সে বাড়ির বাইরেই থাকে।
• স্কুলের কাজ করার ব্যাপারে তার যথেষ্ট ইচ্ছা ও থাকে।	• স্কুলের কাজ করতে অনিচ্ছা দেখা যায়।

শিশু ও কিশোরকিশোরীদের স্কুল প্রত্যাখ্যানের সমস্যার সাথে কিভাবে মোকাবিলা করবে ?

- শিশুরা কি বলতে চাইছে বা তাদের কি সমস্যা হচ্ছে সেটা সবসময় শোনা দরকার ও যত্ন সহকারে ব্যাপারটা দেখা দরকার। অনেকসময় শিশুদের মধ্যে পরীক্ষার ভয়, অন্য ছাত্র দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার ভয় লক্ষ্য করা যায়।
- যদি স্কুলে সেরকম কোন সমস্যা না থাকে তাহলে শিশুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার উদ্বেগ বা অন্যান্য উদ্বেগ দেখা যেতে পারে , সেক্ষেত্রে বাবা মায়ের সমর্থন ও উৎসাহ শিশুকে এই সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে।
- অভিভাবকরা শিশুদের এই স্কুলে অনুপস্থিতি বা স্কুলে না যাওয়ার ইচ্ছা , দৈহিক সংকেত ইত্যাদি একটি খাতায় নোট রাখতে পারেন, তাতে তারা শিশুর এই সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভালবাসে বুঝতে পারবেন।
- এটা অভিভাবকদের থেকে জানতে হবে শিশু কি এই প্রবনতা ছুটির দিনে দেখা যায় না সে শুধু স্কুলে যাওয়ার দিনগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়।
- শিশুর বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সেটা বাড়ির হোক বা স্কুলের তার সাথে খুব যত্ন সহকারে কথা বলতে হবে।
- শিশুর জীবনে হঠাৎ কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে কিনা জানতে হবে।
- বাড়ি বা স্কুল নিয়ে শিশুর মধ্যে কোন সমস্যা থাকলে তা মেটানোর চেষ্টা করতে হবে।
- শিশুকে বোঝাতে হবে যে আপনিও তার সমস্য নিয়ে সমব্যথী। সে যদি স্কুলে যেতে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে তার সমস্যা মিটে যাবে কিন্তু যদি এড়িয়ে চলে তাহলে সেটা সমধান হবে না।
- তার বন্ধুদের দিয়েই তাকে উৎসাহি করে তুলতে হবে। তার বন্ধুদের সাথে তাকে কথা বলাতে হবে।

- স্কুল প্রত্যাখানের ব্যাপারে অভিভাবকরা জানতে পারলে তাদেরকে দেখতে হবে কিভাবে সেটা দূর করা যায়। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।
- অভিভাবকদের বোঝাতে হবে কিভাবে শিশুকে আবার স্কুলে পাঠানো যায়।
- শিশুকে তার পছন্দের জিনিস দিয়ে তাকে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে যদি তাকে স্কুলে যাওয়াতে আগ্রহী করানো যায়, তাহলে সেটা অভিভাবককে করতে হবে।
- শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে যখন শিশু বাড়ি যেতে চাইছে সেটার সত্যি কোন কারন আছে কিনা না সে এই উদ্বেগজনিত কারনেই বাড়ি ফিরে যেতে চাইছে। তাহলে সেইমত শিশুকে বোঝাতে হবে

খাবার প্রত্যাখান (Food Refusal):

খাবার নিয়ে সমস্যা কিভাবে তৈরি হয়?

- ছোট শিশুদের খাবার নিয়ে সমস্যা দেখা যায় কারন তাদের কি ধরণের ও কতটা পরিমান খাবার চাই এই ব্যাপারে পরিবারের লোকজনদের অবাস্তব ধারনা থাকে।
- একজন সাধারন ছোট শিশু যাদের বয়স ৬ মাসেরও কম তারা বেশিরভাগ সময়েই কম খায়। কিন্তু একটি ৬ মাসের শিশুর প্রত্যেক ৮ সপ্তায় ১ কিলোগ্রাম করে ওজন বাড়ে। এর নীচে যাদের বয়স সেইসব শিশুরা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে না ও এক কিলোগ্রাম বাড়তে ৬ মাস সময় নেয়, তাই এদের খিদে কম তাই কম খাবার দরকার।
- অনেকসময় পরিবারের সদস্যরা শিশুদের সারাদিন ধরে স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার খাওয়ার যাতে তারা ক্ষুধার্ত বোধ না করে, কিন্তু এতে ঐ শিশুরা আসল খাবারটি আর খেতে পারে না বা খাওয়ার মত পেতে জায়গা থাকে না তাদের।
- সারাদিন ধরে অনেক পরিমান দুধ বা অন্য কোন পানীয় ছোট শিশুকে দেওয়াটাও ঠিক না, সেটা তাদের খাওয়ার ইচ্ছেটা কমিয়ে দেয়। এরথেকে খবারের পরিমানের উপর নজর দিতে হবে। সাধারণত ৬০০মিলি. দুধ ও ১২০মিলি জুস বা ফলের রস একদিনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট, জলও খাওয়ানো যায়।
- শিশুর খাবারের ইচ্ছা নির্ভর করে সে কতটা ক্ষুধার্ত তার উপর। তাদের কতটা খিদে পাচ্ছে সেটা নির্ভর করে সে কতটা বাড়ছে বা বাড়ছে না , কতটা ক্লান্ত বা দুর্বল এগুলির উপরে। মনে রাখা দরকার তারা খায় যখন তারা ক্ষুধার্ত থাকে । অনেকসময় খাবারটা তাদের পছন্দের না হলে বা ঠিকমত রান্না না হলে তারা খেতে চায় না।

শিশুদের মধ্যে খাবার প্রত্যাখান দেখা গেলে কি করতে হবে?

যদি আপনার শিশু ক্রমাগত বেশ কয়েকদিন খাবার খেতে না চায় তাহলে কি করতে হবে তা নীচে বলা হলঃ

- প্রতিদিন খাবার খাওয়ার সময় তাদের খেতে বলতে হবে।
- যদি শিশু তখন খাবারটি না খায় তখন সমস্ত খাবারটি যত্ন সহকারে রেখে দিয়ে পরে আবার খেতে বলতে হবে।
- কোন প্রকার উৎপীড়ন, ঘুষ ইত্যাদি না করাই ভাল।
- শিশুর খাওয়ার আগে তাকে অন্তত ১০ বার বলতে হবে। যদি শুধু চেখে দেখার জন্য কোন খাবার তাকে বারবার দেওয়া হয় তাহলে অনেকসময় ভবিষ্যতে তার খাওয়ার প্রতি ঝোঁক বাড়ে।

আমাদের মনে রাখা দরকার

- শিশু যখন ক্ষুধার্ত হয় তখনই তারা খায়।
- যখন একজন শিশু খেতে চায় না তখন সে ক্ষুধার্ত নয়।
- একজন স্বাস্থ্যকর শিশু কয়েকদিন না খেতে চাইলে মরে যাবে না।

শিশুর মানসিক বিকাশলাভের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির সনাক্তকরণ:

শিশুর বিকাশলাভের প্রত্যেকটি স্তরে তার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে অভিভাবক, শুশ্রুষাকারী, শিক্ষক প্রত্যেকের এটা খেয়াল রাখা দরকার যে তার মধ্যে কোন মানসিক সমস্যার লক্ষন বা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে যেটি তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে কিনা, ফলে সে অন্য শিশুদের থেকে ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে কিনা। এইসব মানসিক সমস্যা বা ব্যাধি গুলো হলঃ

অটিসোম (Autism):

এটি স্নায়ুর বিকাশজনিত একটি মানসিক ব্যাধি যার ফলে শিশু সামাজিকভাবে ঠিকভাবে অন্যদের সাথে মিশতে পারে না, কথা বলতে পারে না, ও তাদের মধ্যে কিছু একইধরনের আচরণ বারবার কতে দেখা যায়। এটি একটি স্নায়ুগত-জৈবিক ব্যাধি। এটি অটিস্টিক স্পেকটার্ম ডিসঅর্ডারের অংশ, যেমন- অ্যাস্পারজারস সিন্ড্রোম , যেখানে জ্ঞানমূলক , ভাষাগত সমস্যা ও Pervasive Developmental Disorder, not otherwise specified (PDD or NOS) ,শিশুর মধ্যে যখন Autism বা asperger's syndrome এর সব লক্ষন দেখা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়

৩ বছর বয়সের আগে থেকেই শিশুর মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। সেগুলি হলঃ

- দেরী করে কথা বলতে শেখা বা একদমই কথা না বলতে পারা, কানে শুনতে নাও পারে আবার কানে শোনার কোন সমস্যা নাও থাকতে পারে।
- বিভিন্ন ধরণের একিরকমের আচরণ বারবার করতে দেখা যায়।
- পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণগুলি হল হাত ঝাপটানো, মাথা ঘোরানো, শরীর দোলানো।
- অনেক সময় নিয়ম মেনে কিছু আচরণ করে , যেমন- কোন বস্তু সারিবদ্ধভাবে সাজানো।
- একঘেয়েমির কোন পরিবর্তনকে বাধা দেয়, যেমন- কোন আসবাবপত্র তার জায়গা থেকে অন্য কোথাও সরানো যাবে না।
- একই ধরনের আচরণ যেমন- রোজ একই খাবার খাওয়া, একই জামা পরা ইত্যাদি।
- নিজেকে আঘাত করা, যেমন- হাত কামড়ানো , ত্বকে আঁচর দেওয়া, মাথা ঠোকা ইত্যাদি।

আরও অন্যান্য কিছু সমস্যাও দেখা যায়ঃ

- অনেক শিশু কম বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।
- কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, দেখা যায়, বিশেষ করে যাদের বুদ্ধি মাঝামাঝি বা তার একটু বেশি হয়।
- বয়ঃসন্ধিকাল থেকে অনেক শিশুর মধ্যে seizure বা Epilepsy দেখা যায় ।

Autism হওয়ার কারণগুলি কি কি?

- জিনগত পরিবর্তন এই রোগের কারন হতে পারে, যমজ শিশু বা ভাইবোনদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।
- গর্ভাবস্থায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ শিশুর মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভবনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- গর্ভাবস্থায় অনবরত জ্বর - যেটা অন্তত ৩ সপ্তাহ অবধি থাকে শিশুর মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা তিনগুন বাড়িয়ে দেয়
- গর্ভাবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ।
- বাবা মায়ের Bipolar বা Schizophrenia রোগ থাকলে।
- গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বায়ুদূষণ ।
- অন্যান্য কারন- টিকাকরন, খাবার,ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান, অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক।

কিভাবে Autism সনাক্ত করা যায় ?

এই রোগ সনাক্তকরনের কিছু গাইডলাইন আছে। সেগুলি হলঃ

- সামাজিক মেলামেশা ও সম্পর্কঃ এইরোগগ্রস্ত শিশুরা চোখে চোখ রাখতে পারে না । অন্যের অনুভূতি বুঝতে এদের অসুবিধা হয়।
- লৌখিক ও অলৌখিক যোগাযোগঃ এই শিশুরা অনেকসময় একদমই কথা বলতে পারে না, বা কোন শব্দ বারবার উচ্চারন করে।
- খেলা বা কাজে অংশগ্রহনঃ ছোট শিশুরা কোন খেলনার একটি অংশ নিয়ে খেলা করে। প্রাপ্তবয়স্করা কোন একটা খেলনাই পছন্দ করে।

অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপারাঅ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার(Attention Deficit Hyperactivity Disorder):

ADHD কাকে বলে?

এই রোগটি খুবই প্রচলিত শৈশবকালীন রোগ যেটা প্রাপ্তবয়স্ককালীন সময় অবধিও দেখা যেতে পারে। এই রোগের লক্ষনগুলি হল - কোনকিছুতে মনোনিবেশ করতে না পারা, নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়তা।

লক্ষনগুলি কি কি ?

তিন ধরণের আলাদা আলাদা চিহ্ন বা লক্ষন দেখা যায়। যথা- অমনোযোগ, অতিরিক্ত সক্রিয়তা, আবেগপ্রবন।

অমনোযোগ (Inattention): স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত শিশুর এই সমস্যাটি অতটা বোঝা যায় না। আর বড়দের ক্ষেত্রে কাজের জায়গা বা সামাজিক পরিস্থিতিতে বোঝা যায়।

- স্কুলের লেখাপড়ায় ছোটখাটো অনেক ভুল, কোন ব্যাপারে মনোযোগী না হতে পারা, কোন কাজ খুব আগোছালভাবে করা।
- চারপাশের উদ্দীপক দ্বারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়, যেসব আওয়াজ অন্যেরা সহজেই এড়িয়ে চলে সিসব ছোটোখাটো আওয়াজে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে যায়।
- কোন কাজে মনযোগী হতে পারে না।
- যেসব কাজে একাগ্রতা দরকার সেইসব কাজ করতে পারে না।
- খুব তাড়াতাড়ি একটা কাজ থেকে অন্য কাজে মনোযোগের বিচলন।
- বিলম্ব বা গতিক্রিয়া (যে কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাতে কম গুরুত্ব দেওয়া)।
- এলোমেলোভাবে কাজ করা।
- রোজকার কোন কাজ মাঝেমধ্যেই ভুলে যাওয়া (দেখা করতে ভুলে যাওয়া, খাবার নিয়ে যেতে ভুলে যাওয়া)।
- কথাবলার সময় বারবার বিষয় পরিবর্তন, অন্যদের কথা না শোনা, সামাজিক পরিস্থিতিতে কোন নিয়ম না মানা।

অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়তা (Hyperactivity): একদম ছোট বাচ্চাদের যারা তখনও স্কুলে যায় না তাদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায় ও সাত বছর বয়েসের আগে অবধি সবসময় থাকে।

- স্নায়বিক অস্থিরতায় ভোগা।
- বারবার হাটা বা দৌড়ানো।
- অনুপযুক্ত পরিবেশে সমানে দৌড়ানো বা চড়ে ওঠা ।
- চুপচাপ বসে বসে খেলতে পারে না।
- সবসময় যাওয়ার তাড়া থাকে।
- অনেকসময়েই প্রচণ্ড কথা বলে।

আবগপ্রবনতা (Impulsivity): নিজেদের নিয়ন্ত্রনে অসুবিধা বোধ করে।

- চিন্তাভাবনা না করেই কাজ করে
- কোন প্রশ্ন পুরো শোনার আগে উত্তর করতে শুরু করে।
- নিজের পালা আসা অবধি অপেক্ষা করতে পারে না।
- সময় অনুযায়ী ঠিক কথা বলে না।
- অন্যদের কথার মধ্যে কথা বলে।
- আবেগ নিয়ন্ত্রনে অসামর্থ্য , রেগে গেলে প্রচণ্ড রাগ দেখায়।
- সমস্যা সমাধান করতে সময় না নিয়ে আন্দাজে বলার প্রবনতা দেখা যায়।

ADHD এর কারণগুলি কি কি?

গবেষকরা এর কারন নিয়ে নিশ্চিত নয়। অনেকে বলে জিনগত কারনে হয়, এছাড়াও সামাজিক, মস্তিষ্কের আঘাত, পুষ্টির অভাব ইত্যাদি কারণও হতে পারে।

- জিনগত কারনঃ অনেক গবেষণা থেকে জানা গেছে এটি পরিবারের মধ্যে হয়। কিছু মানুষের মধ্যে এই জিন থাকে যার জন্য এই রোগ হতে পারে।
- পরিবেশগত কারনঃ গর্ভাবস্থায় মায়ের সিগারেট ও মদ্যপান।
- মস্তিষ্কের আঘাতঃ যেসব শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগে তাদের আচরণে এই রোগের লক্ষন দেখা যায়।
- খাদ্যঃ সাম্প্রতিক একটি ব্রিটিশ গবেষনায় দেখা গেছে খাবার রং ও অন্যান্য কিছু খাবার থেকে হতে পারে।

ADHD কিভাবে সনাক্ত করা যায়?

এই রোগের লক্ষন মোটামুটি ৩-৬ বছর বয়স থেকেই দেখা যায়. এই লক্ষন ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়, তাই রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা হয়। অভিভাবকেরা প্রথম যেটা লক্ষ্য করে তার শিশুর মধ্যে ইচ্ছা কমে যাচ্ছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। স্কুলে শিক্ষকরা বুঝতে পারে যখন শিশুটি কোন নিয়ম মেনে চলতে পারছে না, সবসময় ক্লাসরুম বা খেলার মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এটা ADD / ADHD বা অন্য কোন অসুবিধা কিনা জানা দরকার কেন?

শিশুর মধ্যে শুধু অমনোযোগ , অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়তা, বা আবেগপ্রবনতা থাকলেই সেটা ADD বা ADHD হবে এরম কোন কথা নেই, কারন অনেকসময় বিভিন্ন মানসিক চাপে, কোন খারাপ ঘটনা ইত্যাদি কারনেও শিশুর মধ্যে এই রোগের মতই লক্ষন দেখা যায়।

এই রোগ নির্ণয়ের আগে দেখে নেওয়া উচিত শিশুর মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষনগুলির সম্ভাবনা আছে কিনা।

- পড়াশোনা বা শিক্ষন নিয়ে কোন সমস্যা আছে কিনা (পড়া , লেখা, পেশীগত, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে)।
- জীবনের কোন আঘাতমূলক ঘটনা বা অভিজ্ঞতা (কারুর মৃত্যু, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি)।
- উদ্বেগ, হতাশা, বাইপোলার ডিসঅর্ডার ইত্যাদি কোন মানসিক সমস্যা।
- অন্য আচরণগত সমস্যা (যেমন- Conduct Disorder & Oppositional Defiant Disorder)।
- থাইরয়েড, এপিলেপ্সি, ঘুমের সমস্যা, স্নায়ুগত সমস্যা ইত্যাদি আছে কিনা।

ADHD কত প্রকারের হয়?

প্রধানত তিন ধরণের ADHD দেখা যায়।

- Combined ADHD : (সব থেকে বেশি প্রচলিত)। এখানে অমনোযোগ , অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়তা, বা আবেগপ্রবনতা এই তিনটির লক্ষণই দেখা যায়।

- Inattentive ADHD: (আগে এটি ADD নামে প্রচলিত ছিল)। এখানে একাগ্রতা বা মনোযোগের অভাব দেখা যায়
- Hyperactive-impulsive ADHD: এখানে শুধু অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়তা দেখা যায়।

ADHD নির্ণয়ের জন্য ৭ বছর বয়সের আগে এমন কিছু লক্ষন থাকতে হবে যেগুলি ক্ষতিসাধন করবে এবং সেটি জীবনের একের বেশি ক্ষেত্রে প্রকাশমান। যেমন- কোন ব্যক্তির সমস্যাগুলি স্কুলে ও বাড়িতে বা কাজের জায়গা ও বাড়িতে দেখা যায়। এছাড়া এটাও দেখে নিতে হবে এই তার এই সমস্যাগুলি তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলছে।

ADHD এর ইতিবাচক প্রভাব কি কি?

যাদের মধ্যে এই রোগের চিহ্ন দেখা যায় তাদের মধ্যে এর পাশাপাশি কিছু ভাল গুনও লক্ষনীয়।

- সৃজনশীলতাঃ এরা বেশ সৃজনশীল হয়, ও এদের কল্পনা করার ক্ষমতা ভাল এরা কোন সমস্যা তাড়াতাড়ি সমাধান করে নিতে পারে। এরা সহজে বিভ্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় অন্যেরা যেটা খেয়াল করে না তারা দেখতে পায়
- নমনীয়তাঃ এরা কোন একটা ধারনা নিয়ে বসে থাকে না।
- উদ্যম ও স্বতঃস্ফূর্ততাঃ এরা একঘেয়ে না, এদের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কৌতুহল আছে, ও ভীষণ হাসিখুশি ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
- প্রবল সক্রিয়তা ও ইচ্ছাঃ যদি এইসব শিশুকে উৎসাহী করে তোলা যায় তাহলে এরা অনেক সময় মন দিয়ে কোন কাজ সফলভাবে করতে পারবে।

নোট - ADHD বা ADD শিশুদের অনেকেই উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

যেসমস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের ADHD বা ADD আছে তাদের জন্য কি কি টিপস বা পরামর্শ দেওয়া হয় ?

যেসব শিশুরা অমনোযোগী , অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়, ও আবেগপ্রবন তাদেরকে পরিচালনা করতে গেলে অনেক শক্তির প্রয়োজন। অনবরত তাদের পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন।কিন্তু কিছু উপায়ে আপনি আবার আপনার কর্মশক্তি ফিরে পেতে পারেন ও আপনার শিশুকে নানা কাজে সাহায্য করতে পারবেন।

কিছু কার্যকরী অভিভাবকতার কৌশল অবলম্বন করে শিশুর সমস্যাজনক আচরণ অনেকটা শুধরে নেওয়া যায়। এই সমস্ত শিশুদের দরকার ভালবাসা, সমর্থন, উৎসাহ, পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ, সামঞ্জস্যতা ।

অভিভাবকরা নানা উপায়ে শিশুদের ক্রিয়াশীলতা, কর্মশক্তি, স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই তাদের মধ্যে থেকে ADHD বা ADD এর চিহ্ন বা লক্ষন দূর করতে পারেন।

ADHD বা ADD শিশুদের স্কুল সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ কি হতে পারে?

এই সমস্ত শিশুরা অমনোযোগী, সবসময় ক্লাসে ঘুরে বেরানর একটা প্রবনতা থাকার ফলে তারা ঠিকমত পড়াশোনা করতে পারে না। এটা ভাবতে হবে তাদের জন্য স্কুলের পরিবেশ কি ধরনের হওয়া উচিত বা তারা স্কুল থেকে কি কি চায়। " চুপ করে বসো, মন দিয়ে শোনো "- এই সব নির্দেশ তাদের ইচ্ছা থাকলেও মানতে পারে না কারন তাদের মস্তিক তাদের করতে দেয় না। তার মানে এটা নয় যে এইসব শিশুরা সফল হবে না । অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাহায্যে তারা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে। এরজনয প্রত্যেকটি শিশুর ভাল-খারাপ দিক দেখে নিয়ে সেইমত তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।

ADHD এর সাথে আর অন্য কি কি সমস্যা থাকতে পারে ?

Anxiety Disorder: কোন কোন শিশুর ADHDএর সাথে উদ্বেগ জনিত কিছু সমস্যা দেখা যায়। প্রচণ্ড ঘাম হওয়া, মাথা ঘোরা, দ্রুত হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি শিশুর মধ্যে দেখা যায়।

Oppositional Defiant Disorder (ODD): অনেকসময়েই ADHD রোগগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে ODD দেখা যায়। এইসব শিশুদের মধ্যে নেতিবাচক ও সংহতিনাশক আচরণ দেখা যায়।

Depression: অনেক সময় এদের মধ্যে হতাশা দেখা যেতে পারে।

Learning Disability:

Learning Disability কাকে বলে?

এই সমস্ত শিশুদের মধ্যে শিক্ষন সংক্রান্ত অনেক ধরণের সমস্যা থাকতে পারে। এরা কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন বা অলস নয়। এটা বুদ্ধিসংক্রান্ত সমস্যা নয়। তাদের মস্তিষ্কের গঠনমূলক কিছু সমস্যা থাকতে পারে।

Learning Disability এর কি কি চিহ্ন বা লক্ষন দেখা যায়?

এই সমস্যা সবসময় নির্ণয় করা যায় না। কারন এটির লক্ষন বা চিহ্ন গুলোও ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হয়। সেগুলি হলঃ

প্রিস্কুলারদের লক্ষন:

- শব্দ উচ্চারণে সমস্যা।
- ঠিক শব্দ খুঁজে বের করার সমস্যা।
- ছন্দে বলতে পারে না।
- অক্ষর, নম্বর, রং। আকার, দিন ইত্যাদি বিষয় শিখতে সমস্যা।
- রং পেনসিল, পেনসিল, কাঁচি দিয়ে কোন হাতের কাজ ও লাইনের মধ্যে রং করা ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা।
- বোতাম, চেন, জুতো বাধার ব্যাপারে সমস্যা।

৫-৯ বছরের শিশুদের লক্ষনঃ

- অক্ষর ও আওয়াজের সংযুক্তিকরণ শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা।
- শব্দ তৈরি করতে গেলে আওয়াজ করতে হয় তাতে সমস্যা।
- রিডিং পড়ার সময় প্রাথমিক কিছু শব্দ গুলিয়ে ফেলে।
- পড়ার সময় শব্দ ভুল উচ্চারন করে।
- সময় বলতে অসুবিধা হয়, কোনটার পর কোনটা আসবে সেটা মনে রাখতে পারে না।
- প্রাথমিক স্তরের অঙ্ক শিখতে অসুবিধা হয়।
- নতুন কিছু শিখতে দেরী হয়।

১০-১৩ বছরের শিশুদের লক্ষনঃ

- রিডিং পড়তে ও অঙ্ক করতে অসুবিধা।
- শব্দ সংক্রান্ত ও প্রশ্ন করলে তা উত্তর দিতে সমস্যা।
- রিডিং পড়তে ও লেখার সমস্যা।
- কোন বইএর একটা পাতা পড়ার সময় একই শব্দ একেকবার একেকরকমভাবে উচ্চারন করে।
- কোন কিছু গুছিয়ে রাখতে পারে না, এলোমেলো ভাবে রাখে।
- ক্লাসে কোন বিষয়ে আলোচনা করলে তা বুঝতে পারে না , বা নিজের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারে না।
- খারাপ হাতের লেখা

প্রকারভেদঃ

Dyslexia	রিডিং পড়ায় সমস্যা	পড়া,লেখা, বানান, বলা ইত্যাদিতে সমস্যা
Dyscalculia	অঙ্ক নিয়ে সমস্যা	টাকা পয়সা, সময় নিয়ে বিভিন্ন অঙ্ক করতে সমস্যা
Dysgraphia	লেখাতে সমস্যা	হাতের লেখা, বানান, ধারনা গঠনে সমস্যা
Dyspraxia (Sensory Integration Diso	সূক্ষ্ম পেশীগত দক্ষতায় অসুবিধা	চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন, কোন ব্যালেন্স করতেও সমস্যা।
Dysphasia/ Aphasia	ভাষাগত সমস্যা	ভাষা বুঝতে, রিডিং পড়তে অসুবিধা।

Auditory Processing Disorder	বিভিন্ন শব্দ শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা	পড়া, বোধশক্তি, ভাষাগত অসুবিধা
Visual Processing Disorder	দৃষ্টিসংক্রান্ত তথ্য বুঝতে অসুবিধা	রিডিং পড়া, অঙ্ক, মানচিত্র,

নোট -স্কুলে পরাশোনায় সমস্যা শুধুমাত্র Learning Disability থাকলেই হয় তা না। উদ্বেগ, হতাশা, মানসিক চাপ, আবেগমূলক সমস্যা ইত্যাদি অন্যন্য কারনও এর জন্য দায়ী। আবার অনেকক্ষেত্রে ADHD ও Autism একই সাথে থাকতে পারে,এমনকি Learning Disability ও থাকতে পারে , তাই অনেকক্ষেত্রে ঠিক রোগটি নির্ধারণে সমস্যা দেখা যায়।

অন্য আর কি কি ব্যাধির জন্য পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা বা Learning Disorder দেখা যায়?

উদ্বেগ, হতাশা, মানসিক চাপ, আবেগমূলক সমস্যা ইত্যাদি অন্যান্য কারনেও শিশুর পড়াশোনাতে প্রভাব ফেলে। ADHD, Autism ও শিশুর পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করে।

Learning Disorder এর কারণগুলি কি কি?

এই ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্র জনিত সমস্যা প্রধানত দায়ী। মস্তিষ্কের হয় আকারগত নয় কাজ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা যায়। এর জন্য তাদের বাইরের উদ্দীপক গ্রহন,বাইরের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যদের থেকে আলাদাভাবে হয়।এইরকম মস্তিস্কজনিত সমস্যা বিভিন্ন কারনে হতে পারেঃ

- অপরিপক্কতা
- গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা, জন্মের সময় বা জন্মপরবর্তী সমস্যা।
- মস্তিষ্কজনিত কোন আঘাত।
- ঔষধ সম্পর্কিত কারন।
- টক্সিন (লেড) জাতীয় কিছুর প্রভাব।

Learning Disability এর লক্ষণগুলি কিভাবে সনাক্ত করা যায় ?

ছোট শিশুদের বিকাশজনিত ধাপগুলি খুব ভাল করে লক্ষ্য করা উচিত। বিকাশজনিত স্তরের প্রথমদিকে যদি কোন বিশেষ কোন সমস্যা ধরা পরে তাহলে বুঝতে হবে এটি Learning Disability এর প্রথম স্তর হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সমস্যা ধরা পরবে তত তাড়াতাড়ি সেগুলি সমধানের চেষ্টা করা যাবে। এরপর শিশু বড় হবারপর লক্ষনগুলি আরও ভালভাবে বোঝা যাবে।

Conduct Disorder:

Conduct Disorder কাকে বলে?

এটি হল কিছু আচরণগত ও আবেগজনিত সমস্যা যেটা ছোট শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। আর এই সমস্ত শিশুরা কোন নিয়ম মেনে চলতে পারে না, সমাজ অনুমোদিত পথ অনুসরন করে না। সমাজ এদের মানসিকভাবে অসুস্থ বলে মনে করার থেকেও বাজে বা খারাপ মনে করে।

Conduct Disorder এর চিহ্ন বা লক্ষন কি কি?

মানুষ ও প্রানীদের উপর রাগ দেখানোঃ

- উৎপীড়ন, অন্যকে হুমকি দেওয়া।
- প্রায়ই মারামারি করা।
- এমন কোন অস্ত্র ব্যবহার করে যা দৈহিক কোন ক্ষতি করতে পারে (উদাহরণ- ইট, ব্যাট, ভাঙা বতল,বন্দুক, ছুরি ইত্যাদি)।
- মানুষ বা জীবজন্তুর দৈহিক অত্যাচার।
- যৌন কাজকর্ম করতে কাউকে বাধ্য করা।

সম্পত্তি ধ্বংস করাঃ

- ক্ষতি করার জন্য ইচ্ছা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।
- অন্যের সম্পত্তি ধ্বংস করা।

কপটতা , মিথ্যা বলা, চুরি করাঃ

- কারুর বাড়ি, ঘর, গাড়ি ভেঙে দেওয়া।
- কারুর থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য বা জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য মিথ্যা বলা
- জিনিসপত্র চুরি করা।

নিয়ম-কানুন ভাঙাঃ

- বাবা মা বারন করা সত্ত্বেও রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে থাকা।
- বাড়ি থেকে পালানো।
- স্কুল থেকে পালানো।

Conduct Disorder এর কারণগুলি কি কি ?

- শিশুর অপব্যবহার বা অবমাননা।
- বাবা মায়ের নেশাগ্রস্ত দ্রব্য সেবন।
- পারিবারিক দ্বন্দ্ব।

মূল্যবোধর শিক্ষা:

মূল্যবোধ কি?

মূল্যবোধ হল নীতি বা আদর্শ যা এক ব্যক্তিকে ভালভাবে বা ভালো মনের জীবনধারনে সাহায্য করে। কি আচরণ করা উচিত এবং কি আচরণ করা উচিত নয় তা নির্ধারণ করে। চরিত্রের মৌলিক গঠন এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন মূল্যবোধ থাকতে পারে, তারা যা মনে করে তা সঠিক বা ভুল হতে পারে, এবং তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে তারা যা অনুশীলন করে তাই আসলে তাদের জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। তবে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মানবতা ও মানবজাতির বেঁচে থাকার উপর ভিত্তি করে জীবনে কিছু সার্বজনীন মূল্যবোধ থাকে।

মূল্যবোধের শিক্ষা কি?

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারায় মূল্যবোধের শিক্ষার অর্থ বিভিন্ন। এই শিক্ষণের মধ্যে পরে নৈতিক শিক্ষা, নাগরিকতার শিক্ষা, জীবন- দক্ষতার শিক্ষা ইত্যাদি। এই শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে পরে নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি। অনেকের মতে, যে পদ্ধতিতে শিক্ষক তার ছাত্রদের মূল্যবোধ শেখান সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে মূল্যবধের শিক্ষা বলে। এইখানে মূল্যবোধের শিক্ষা আলোচনা করার লক্ষ্য হল জীবনে মূল্যবোধ শেখার গুরুত্ব কি তা জানা যেটা শিশুর ইতিবাচক বিকাশ ও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জগতের সাথে নিজিকে মানিয়ে নিয়ে চলতে শেখাবে, ও জীবনের প্রতি সঠিক মানসিকতা গড়ে তুলবে।

মূল্যবোধের শিক্ষার লক্ষ্য কি ?

মূল্যবোধের শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুকেঃ

- তার নিজের আচরণে যেসব মূল্যবোধ আছে তা সনাক্ত করতে শেখাবে।
- নিজেদের ও অন্যের ভাল থাকার জন্য এইসমস্ত আচরণ ও মূল্যবোধের বিচার করতে শেখাবে।
- নিজেদের ও অন্যের ভাল থাকার জন্য অন্যের আচরণ ও মূল্যবোধ অনুসরন করা।
- এইসমস্ত মূল্যবোধকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

কিভাবে মূল্যবোধ গঠন করা যায়?

- আমাদের ধর্ম, সমাজ,সংস্কৃতিক রীতি নীতি থেকে যেসমস্ত মূল্যবোধ আসে সেগুলি সংবাহিত করা বা প্রেরন করা।
- এরপর ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে ভাল ও মন্দের বোধ আনা।
- যখন শিশু বা কিশোর কিশোরীদের মূল্যবোধ শেখানো হয় তখন বিভিন্ন নৈতিক উন্নয়নের ধাপগুলির কথা মাথায় রাখা উচিত।
- কোহলবার্গের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু নৈতিক আচরণ শেখে তার বাবা মায়ের সামনে ভাল মেয়ে বা ভাল ছেলে থাকার জন্য যাতে তাকে কোন শাস্তি না পেতে হয় ও কেউ তাকে খারাপ মেয়ে বা খারাপ ছেলে না বলতে পারে। তখন তারা ঐসব নৈতিক আচরণ মেনে চলে কারন তাদের বলা হয় বলে, কিন্তু এগুলোর গুরুত্ব তারা তখনও বুঝতে পারে না।
- এরপর যখন তারা কৈশোরকালে পা দেয় তখন পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তখন তারা প্রত্যেকটি মূল্যবোধের মানে জানতে চায়। তারা নিজেদের চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশ করতে শেখে। এরপর যেসব মূল্যবোধের সঠিক মানে বুঝতে পারে বা ঠিক মনে হয় তখনই তারা সেটা মেনে চলে।

জীবনে কি কি মূল্যবোধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?

নিজেদের ও গোটা সমাজের উন্নতিসাধনযোগ্য আচরনের উপর মূল্যবোধের গুরুত্ব নির্ভরশীল। জীবনে এরকম অনেক মূল্যবোধ আছে যেগুলির গুরুত্ব অনেক ও শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন মূল্যবোধের গুরুত্বের অনেক পরিবর্তন ঘটে । ছোটবেলায় যেসব মূল্যবোধ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বড় হওয়ার পর সেগুলি অতটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। যেমন- ছোটবেলায় বড়দের উপর নির্ভরশীল হতেই হয়, কারন তখন জ্ঞানমূলক বিকাশ শিশুদের মধ্যে পুরোপুরি হয় না তারপর বড় হওয়ার পর তাদেরকে নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত একা নিতে উৎসাহী করে তোলা হয়।

<u>৫-১০ বছরঃ</u>

৫- ১০ বছরের শিশুদের যেসমস্ত আচরণ শেখনো হয় সেগুলি হলঃ

<u>নিজের যত্ন নেওয়াঃ</u>

- খাওয়া
- জামাকাপড় পরা
- পরিষ্কার রাখা (চান করা, ব্রাস করা, নিজের জামাকাপড় ধোয়া)
- বাড়ির কাজ করা
- নিজের স্কুলের ব্যাগ নিজে গুছিয়ে নেওয়া।

সুস্থ সবল থাকাঃ

- খাবার
- ব্যায়াম
- পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা (নিজের স্কুলের জামা, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া)।

সামাজিকতাঃ

- পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলামেশা করা
- অন্যের আবেগ ও অনুভূতিকে বোঝা
- অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া
- অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে শেখা
- বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে সহযোগিতা করা
- কারুর দরকারে সাহায্য করা

সুরক্ষিত পরিবেশঃ

- পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
- গাছপালা লাগানো
- জীবজন্তুদের রক্ষা করা

শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বঃ

- কেন আমাদের শেখা দরকার?
- জ্ঞান কি?
- নৈতিকতা কি?
- সততার মানে কি?
- সততা কি?

১১-১৬ বছরঃ

শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের ছিন্তাধারার পরিবর্তন হতে থাকে। তারা যেকোনো নীতি মানার আগে প্রশ্ন করে ও তারা যদি তাদের মনের মত উত্তর পায় ও সঠিক মনে করে তবেই সেটা তারা মেনে চলে। এইভাবে প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়েই তাদের জন্য নীতি গড়ে তুলতে হবে।

কেন এগুলো আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ?

- সময়ের মূল্য
- টাকার মূল্য
- সম্পর্কের মূল্য
- জীবনের মূল্য
- প্রতিশ্রুতির মূল্য
- দায়িত্ববোধ
- আত্মসম্মান
- আবেগজনিত স্থায়িত্ব
- কাজের পরিকল্পনা
- রুটিন মেনে চলা
- সময়ের সঠিক পরিচালনা
- পেশাগত লক্ষ্য স্থাপন

আমাদের জানতে হবেঃ

- কৈশোরকালে কি কি পরিবর্তন আসে ?
- ভাল বন্ধু বেছে নেওয়া উচিত কেন ?
- কেন বড়দের কথা মেনে চলা উচিত?
- জীবনের লক্ষ্য কি?
- সামাজিক মূল্যবোধ কখন একজন মেনে চলবে বা চলবে না ?
- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ কি কি?
- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ মেনে চলার অসুবিধা কি কি?

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কি?

টেবিল -৯ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য

মূল্যবোধ	নৈতিকতা
মূল্যবোধ হল কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত কিছু নিয়মের সমষ্টি।	নৈতিকতা হল কিছু নিয়মের সমষ্টি যেটা সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে।
মূল্যবোধ হল ব্যক্তিগত বিশ্বাস।	নৈতিকতা হল বিশ্বাস যেটা আমাদের ভাল ও মন্দের বিচার করে।
নৈতিকতার মতো মূল্যবোধের সেই সামাজিক স্বীকৃতি নেই।	নৈতিকতা সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি ।
মূল্যবোধহীন মানুষ হয় না।	যাদের মধ্যে নীতিবোধ নেই তারা অনৈতিক।
মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে থাকেই। সেটা ভাল বা মন্দ তা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল।	ভালভাবে জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা আমাদের প্রেরণা যোগায়।
মূল্যবোধ আমাদের ভাল-মন্দ, ঠিক -বেঠিক ইত্যাদির বিচার করতে শেখায়। মূল্যবোধ মধ্যে পরে সাহস, সম্মান, দেশাত্ববোধ, সততা, শ্রদ্ধা, সমবেদনা।	নৈতিকতা একজনের ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত। ব্যবসায়িক নীতির মধ্যে পরে দ্রুত পরিষেবা, উৎকর্ষ, গুন, সুরক্ষা।
মূল্যবোধ সমাজ বা শিক্ষক দ্বারা নির্ধারিত নয়, এটি ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। যেটা একজনের জন্য ঠিক সেটা অন্যের জন্য ঠিক নাও হতে পারে। এটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি যেটা পরিস্থিতি, সময় অ চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।	নৈতিকতা হল বড়দের আদেশ যা ছোটরা পালন করে। ধর্মীয় শিক্ষক, সামাজিক নেতা , গুরুজন প্রমুখ দ্বারা এগুলি নির্ধারিত হয়।

নিম্নোক্ত চেকলিস্ট দিয়ে কোন ব্যক্তি তার নিজের মূল্যবোধের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারেঃ

মূল্যবোধ	অতি প্রয়োজনীয়	প্রয়োজনীয়	কম প্রয়োজনীয়
আমার স্বাস্থ্য ভাল রাখা উচিত			
আমার নতুন জিনিস শেখা উচিত			
আমার নিজের মতন করে বেড়ে ওঠা উচিত			
আমার কাজের বাইরে নিজের জীবনের জন্য সময় ও শক্তি থাকা উচিত			
আমার নতুন মানুষজনের সাথে মেলামেশা উচিত			
আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকা উচিত			
আমার একটা নির্দিষ্ট কাজ থাকা উচিত			
আমার উর্ধ্বতন ব্যক্তির ন্যায়পরায়ন হওয়া উচিত			
আমার উর্ধ্বতন ব্যক্তি এমন হওয়া উচিত যার সাথে সহজে চলা যায়			
আমার আরামদায়ক জায়গায় কাজ করা উচিত			
আমার সুরক্ষিত জায়গায় কাজ করা উচিত			
আমার পছন্দসই মানুষের সাথে কাজ করা উচিত			
আমার সঠিকভাবে জানা উচিত আমায় কি করতে হবে			
পৃথিবীকে আমার আরও উন্নত করা উচিত			
যেটা আমার প্রয়োজনীয় মনে হয় সেরকম কিছু করা উচিত			
আমার অনেক টাকা পয়সা করা উচিত			
আমার কাজের পরিনতি আমার দেখা উচিত			
আমার কাজের একটি বিশেষ নামকরণ থাকা উচিত			
আমার পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা উচিত			
আমার অন্য কর্মীদের প্রতি কর্তব্যপরায়ন হওয়া উচিত			
আমার পরিবেশ রক্ষনাবেক্ষন করা উচিত			
আমার আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠা উচিত			
আমার শারীরিক কাজকর্ম করা উচিত			
আমার জীবনের উন্নতির জন্য পরিবর্তনের সুযোগ পাওয়া উচিত			
পৃথিবীকে আমার আরো সুন্দর করে তোলা উচিত			
আমার একটা কঠিন কাজ শেষ করা উচিত			

আমার একটা কাজ ভালো করে করা উচিত			
আমার অন্য লোকেদের সাথে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত			
আমার নিজের উপর কর্তৃত্বস্থাপনের সুযোগ পাওয়া উচিত			
আমার নতুন বিষয় ও চিন্তাধারার সৃজনশীল হওয়া উচিত			
আমার কাজের সময় নিজের নির্ধারণ করা উচিত			
আমার কাজ নিজে পরিকল্পনা করা উচিত			
আমার কাজের ধারা নিয়ন্ত্রন করা উচিত			
আমার নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা উচিত			
আমার সবথেকে ভালো দক্ষতা দেখানো উচিত			
আমার পছন্দসই কাজ থাকা উচিত			
আমার প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক কাজ থাকা উচিত			
আমার উত্তেজনামূলক কাজ থাকা উচিত			
আমার সহজ কাজ থাকা উচিত			